গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭১ বর্ষ ৪৯ সংখ্যা | ১৯ - ২৫ জুলাই ২০১৯ | www.ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ২ টাকা

বিজেপি ও তার সরকার

জনমনে অসন্তোষ ও প্রশ্ন ইতিমধ্যেই

নির্বাচনের আগে বিজেপি নেতারা উত্তরবঙ্গে গিয়ে প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছিলেন, তাঁরা ক্ষমতায় ফিরলে সমস্যা-জর্জরিত চা-শ্রমিকদের জীবনে সুরাহা এনে দেবেন। অথচ কেন্দ্রীয় বাজেটে উপেক্ষা ছাড়া আর কিছু জুটল না তাঁদের। স্বাভাবিক ভাবেই চা-বলয়ের আক্ষেপ, অপাত্রে ভোট দিলাম। শুধু চা-বলয় নয়, 'বিজেপিকে ভোট দিয়ে কী পেলাম'— এই আক্ষেপ ধীরে ধীরে শ্রমিক-কৃষক-সাধারণ মানুষ— সব মহলেই উঠতে শুরু করেছে।

এ রাজ্যে বিজেপি যাদের ভোটে ১৮টি সাংসদ আসনে জয়ী হল, তাঁদের সকলে যে বিজেপির সমর্থক এমন নয়। এমনকি বেশিরভাগকেই বোধহয় বিজেপির সমর্থক বলা যাবে না। তৃণমূলের দুর্নীতি, তোলাবাজি, জবরদস্তি একটা বিরাট অংশের মানুষকে ক্ষুব্ধ করে তুলেছিল। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল তৃণমূলকে শিক্ষা দেওয়া। কে পারে সেই শিক্ষা দিতে? দু'লক্ষ কোটি টাকা ঢেলে নির্বাচনী প্রচারে বিজেপি মিডিয়ার একটি বড় অংশের যেমন দখল নিয়েছিল তেমনই সোসাল মিডিয়ার প্রচারে দিনকে রাত বানিয়ে ছেড়ে ছিল। এই প্রচারের বন্যায় ভেসে গিয়ে একটা অংশের মানুষ মনে করেছিল, বিজেপিই বোধ হয় পারে তৃণমূলকে শিক্ষা দিতে। প্রচারের শক্তি এমন যে তা তাঁদের একবারও ভাবতে দিল না যে, বিজেপি কী শিক্ষা দেবে তৃণমূলকে? এ রাজ্যে বেশির ভাগ বিজেপি নেতারাই তো সিপিএম-তৃণমূলের দলবদলানো সুযোগ-সন্ধানীরা। তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য তো জনগণের জন্য সরকারি বরাদ্দের যে লুঠতরাজ চলছে, তাতে ভাগ বসানো। এ ছাড়া বিজেপির এই জয়ের পিছনে কাজ করেছিল সিপিএম নেতৃত্বের তৃণমূলকে দুর্বল করার নামে বিজেপিকে শক্তিশালী করার কর্মসূচি।

বিজেপিকে ভোট দেওয়া এই মানুষগুলির অনেককেই আর খুব একটা উৎফুল্ল লাগছে না। এর কারণ কী? পাড়ায়, চায়ের দোকানে কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলতেই জানা গেল, বাজেট তাঁদের দারুণভাবে

দুয়ের পাতায় দেখুন

কর্তৃপক্ষের গাফিলতিতে মর্মান্তিক মৃত্যু

মেট্রো রেল সদর দপ্তরে বিক্ষোভ

কর্তৃপক্ষের গাফিলতিতে এক যাত্রীর মর্মান্তিক মৃত্যুর প্রতিবাদ জানিয়ে পার্ক স্ট্রিটে মেট্রো রেল সদর দপ্তরে বিক্ষোভ দেখাল এআইডিওয়াইও। সংগঠনের কলকাতা জেলা কমিটির পক্ষ থেকে এক প্রতিনিধি দল দপ্তরে আধিকারিকদের সাথে আলোচনায় ট্রেনগুলির নিয়মিত পরীক্ষা না করা, সিসিটিভি মনিটরিং না হওয়া প্রভৃতি প্রশাসনিক ব্যর্থতার দিকগুলি তুলে ধরেন। তাঁরা অবিলম্বে ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করে দোষীদের কঠোর শাস্তি, মৃতের পরিবারকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ, ট্রেনের সংখ্যা বাড়ানো, সমস্ত শূন্যপদে পূর্ণ সময়ের স্থায়ী নিয়োগ প্রভৃতি দাবি জানান। সংগঠনের কলকাতা জেলা সভাপতি সঙ্গীতা ভক্ত বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার বুলেট ট্রেন চালানোর চমক দিলেও সাধারণ মানুষের রেলযাত্রায় ন্যূনতম নিরাপত্তা দিতে পারছে না।

জনস্বার্থে টাকার অভাব, মন্ত্রী-বিধায়কদের বেতন-ভাতা বেড়েই চলেছে

একবার বিধায়ক-সাংসদ হতে পারলে সারাজীবন মিলবে বেতন, ভাতা, পেনশন সহ আরামে দিন কাটানোর যাবতীয় সুবিধা। শুধু নিজে নন, পরিবার পরিজনও তা ভোগ করবেন। অথচ যাদের ভোটে বিধায়ক বা সাংসদ হলেন, তাদের ঘরে উনুন জ্বলে কি না, খাবার জোটে কি না খোঁজ রাখেন না এই জনপ্রতিনিধিরা। তাই বিধানসভায় বা সংসদে জনজীবনের মৌলিক সমস্যাগুলো নিয়ে সোচ্চার হতে, বিতর্ক করতে এই জনপ্রতিনিধিদের দেখা যায় না। বহু জনবিরোধী বিল বিনা বিতর্কেই পাশ হয়ে যায় কেবল সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে। জনপ্রতিনিধিরা বেশি সক্রিয় থাকেন নিজেদের বেতন-ভাতা বাড়াতে। সম্প্রতি রাজ্য বিধানসভায় সেটাই দেখা গেল।

ক'দিন আগে রাজ্য বিধানসভায় মন্ত্রী-বিধায়কদের ভাতা বৃদ্ধির ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী। ১১ জুলাই এ সংক্রান্ত বিলও বিধানসভায় পাশ হয়ে গেল। এতে শাসক বা বিরোধী কোনও দলের বিধায়ককেই তিলমাত্র বিরোধিতা করতে দেখা গেল না। সবাই একজোট। মুখ্যমন্ত্রী মন্ত্রী-বিধায়কদের মাসিক ভাতা বাড়িয়ে যথাক্রমে এক লক্ষ বত্রিশ হাজার ও এক লক্ষ ষোল হাজার টাকা করার ঘোষণা করলেন।

রাজস্ব নেই এই অজুহাতে সমস্ত উন্নয়নমূলক প্রকল্পে সরকারি বরাদ্দে টানাটানি, তখন মুখ্যমন্ত্রী সরকারি কোষাগার থেকে বিধায়কদের ভাতার জন্য বছরে বাড়তি ১৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করে দিলেন অনায়াসে। মন্ত্রী-বিধায়করা কি খুব 'গরিব', তাদের সংসার চলে না? তাছাড়া রাজনীতি করে সংসার চালাবেন ভেবে কি তাঁরা রাজনীতিতে এসেছিলেন? রাজনীতি তা হলে কার জন্যে? নিজের জন্যে, নাকি দেশের কোটি কোটি সাধারণ দরিদ্র নিরন্ন মানুষ, তাদের জন্য? মন্ত্রী বলে, বিধায়ক-সাংসদ বলে, নিজেদের হাতে ক্ষমতা আছে বলে আজ তাঁরা নিজেদের ভাতা-বেতন বাড়িয়ে নিলেন, আর দেশের কোটি কোটি দরিদ্র মানুষ, নিরন্ন মানুষ, বেকারি-মূল্যবৃদ্ধি যাদের প্রতিদিনের মুখের গ্রাসটুকুও কেড়ে

ছয়ের পাতায় দেখুন

প্রাণ হাতে যাত্রাই প্রাপ্তি রেলযাত্রীদের

বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম রেলওয়ে নেটওয়ার্কের নাম ভারতীয় রেল। তার মন্ত্রী সংসদে দাঁড়িয়ে বলছেন, রেলমন্ত্রী হিসাবে তিনি প্রতি রাতে শুতে যাবার আগে প্রার্থনা করেন যেন কোনও রেলব্রিজ ভেঙে না পড়ে।

কারণ বহু রেলব্রিজই অনেক পুরনো। নরেন্দ্র মোদির 'ডিজিটাল ভারতের' 'আধুনিক' রেল ব্যবস্থা থেকে এই দুঃস্বপ্নই প্রাপ্তি দেশের মানুষের! ১১ জুলাই সংসদে রেল বাজেট সংক্রান্ত বিতর্কের উত্তরে রেলমন্ত্রী এমনই 'সুরক্ষিত রেলযাত্রার' আশ্বাস দিয়েছেন।

অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন বাজেট পেশ করার সময়েই ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে, রেলের বেসরকারিকরণই এখন মোদি সরকারের পাখির চোখ। এই সরকার ২০১৪ থেকেই রেলের আলাদা কোনও বাজেট পেশ করছে না, সাধারণ বাজেটেই রেলের বিষয়টি ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। এবারের বাজেটকে ঘিরে চূড়ান্ত শঠতা এবং ধূর্তামির আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। একদিকে অর্থমন্ত্রী বলছেন, বেসরকারিকরণই লক্ষ্য। অন্যদিকে রেলমন্ত্রী তাঁর দপ্তর সংক্রান্ত বিতর্কের জবাবে জানিয়ে দিয়েছেন 'কোনও বেসরকারিকরণ হচ্ছে না'। অবস্থা এমন, এই সরকারের কে ঠিক বলছে তা জানার জন্য রীতিমতো গোয়েন্দা নিয়োগ করতে হবে!

নরেন্দ্র মোদি সরকার দ্বিতীয় দফায় ক্ষমতায় বসেই ১০০ দিনের লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করে বলেছিল, এই সময়ের মধ্যেই দেশের শতাব্দী-রাজধানী এক্সপ্রেসের মতো বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ট্রেনকে বেসরকারি হাতে দেওয়া হবে। বাজেটে সরকার জানিয়ে দিয়েছে সাতটি গুরুত্বপূর্ণ রেল কারখানাকে কর্পোরেট কোম্পানিতে রূপান্তরিত করা হবে। ইতিমধ্যেই চেন্নাইয়ের ঐতিহ্যপূর্ণ ইন্টিগ্রাল কোচ ফ্যাক্টরিতে 'বন্দে ভারত' এক্সপ্রেসের জন্য বিশ্ব মানের কোচ তৈরির অর্ডার সরকার স্থগিত করে দিয়ে বেসরকারি কিছু কোম্পানির সাথে বৈঠক করেছে। যাতে রেলকোচ তৈরির দায়িত্ব বেসরকারি হাতেই তুলে দেওয়া যায়। ভারতীয় রেলশ্রমিক এবং ইঞ্জিনিয়াররা ঘাম ঝরিয়ে রেল কারখানাগুলিতে যে সমস্ত রেল কামরা এবং ইঞ্জিন তৈরি করেন তা সস্তা

দুয়ের পাতায় দেখুন

প্রাণ হাতে রেলযাত্রা

একের পাতার পর

এবং উন্নত হওয়ায় বিদেশে সেগুলির ভালই বাজার আছে। বেসরকারি মালিকদের এই বাজারটি ধরিয়ে দেওয়ার জন্যই সরকার কারখানাগুলিকে কর্পোরেট কোম্পানিতে পরিণত করে পিপিপি মডেল চাইছে। রেলমন্ত্রী বলেছেন, আধুনিক সিগন্যালিং থেকে নতুন লাইন পাতা বা বৈদ্যুতিকীকরণের মতো গুরুত্বপূর্ণ সব কাজগুলিই হবে বেসরকারি কোম্পানির সাথে হাত মিলিয়ে পিপিপি মডেলে। গত বছরের বাজেটেই মোদি সরকার ২৩টি গুরুত্বপূর্ণ রেল স্টেশনকে বেসরকারি হাতে দিয়ে দেওয়া এবং রেলের শতাধিক বছরের পুরনো নিজস্ব প্রেস তুলে দিয়ে টিকিট ছাপা থেকে শুরু করে সমস্ত স্টেশনারি ছাপার কাজ বেসরকারি হাতে দিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। ফলে যাত্রীদের সুরক্ষা নিয়েই প্রশ্ন উঠে যাচ্ছে। এর সাথে মিলিয়ে রেলে খাবার পরিবেশন থেকে শুরু করে যাত্রী পরিষেবার প্রায় সবটুকু তুলে দেওয়া হবে বেসরকারি হাতেই। রেলের হাতে থাকা জমি বেচে ২৫ হাজার কোটি টাকা নাকি সরকার জোগাড় করেছে। সে জমি তো দেশের মানুষের সম্পদ, তা বেসরকারি মালিকদের হাতে সরকার দিয়ে দিল কার স্বার্থে? এখানে কাটমানির কারবারটিও সাধারণ মানুষের জানা। রেলমন্ত্রী বলেছেন ২০৩০-এর মধ্যে ৫০ লক্ষ কোটি টাকা বিনিয়োগ বেসরকারি মালিকদের হাত ধরেই আসবে। তার জন্য এই মালিকদের বিপুল লাভের ব্যবস্থাও সরকারকে করে দিতে হবে। তাহলে বেসরকারিকরণ হচ্ছে না বলে রেলমন্ত্রী সংসদকে ডাহা মিথ্যাটি বললেন কেন?

ইতিমধ্যেই 'প্রিমিয়াম তৎকাল', 'সুবিধা' ইত্যাদির নামে ভাড়া বাড়ানো হয়েছে লাগামছাড়া হারে। আগে কালোবাজারিরা মানুষের জরুরি প্রয়োজনে শেষ মুহূর্তে টিকিট কাটার নিরুপায় অবস্থাকে কাজে লাগিয়ে বাড়তি টাকা রোজগার করত যে পথে, সরকারও একই ভাবে যাত্রীদের সাথে কালোবাজারিদের মতোই আচরণ করছে। তার উপর গুরুত্বপূর্ণ ট্রেনগুলির দায়িত্ব ধীরে ধীরে বেসরকারি হাতে ছাড়ার সাথে তাদের হাতে পরিষেবা খরচের নামে টাকা আদায়ের ক্ষমতাও দেওয়া শুরু হয়েছে। এরপর ধরেই নেওয়া যায় তা আরও বিস্তৃত হবে। রেলমন্ত্রী যেটা বলেননি, রেল কোম্পানি ইতিমধ্যেই ঘুরপথে বিপুল ভাড়াবৃদ্ধির ব্যবস্থা করে রেখেছে আর এক ফন্দিতে। টিকিট কাটার সময়েই রিকুইজিশন ফর্মে জানতে চাওয়া হচ্ছে বর্ষীয়ান নাগরিকরা তাঁদের কনসেশন ছেড়ে দিতে রাজি আছেন কি না! অন্য যাত্রীদেরও 'ভর্তুকি' ছেড়ে দেওয়ার অনুরোধ জানানো হচ্ছে ইন্টারনেট বা কাউন্টার টিকিটের ফরমে। যাঁরা এতে রাজি হবেন, তাঁদের রিজার্ভেশনে রেল অগ্রাধিকার দেবে। ভাবখানা এমন যে সরকার যেন ভর্তুকি দিয়ে রেল চালাচ্ছে! বাস্তবটা কী? এবারের রেল বাজেটে সরকার দেখিয়েছে গত আর্থিক বছরে রেলের মোট আয় ১ লক্ষ ৯৭ হাজার ২১৪ কোটি টাকা এবং খরচ ১ লক্ষ ৯১ হাজার ২০০ কোটি টাকা। অর্থাৎ নেট লাভ ৬ হাজার ১৪ কোটি টাকা। বাজেটের হিসাব দেখিয়েছে প্রতি ১০০ টাকা আয়ে রেলের খরচ ৯৬.২ টাকা (ইন্ডিয়ান রেলওয়েস ডট গভ ডট ইন)। এই আয়ের প্রায় ৮৪ শতাংশ আসে মালগাড়িতে পণ্য পরিবহণ থেকে। সেক্ষেত্রে আগে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলির মাশুলে রেল যে ছাড় দিত এখন তা প্রায় উঠে গেছে। রেলে পণ্য পরিবহণ দিন দিন অতি দামী এবং ঝামেলার হয়ে ওঠার ফলে রেলে পণ্য চলাচল এমনিতেই কমছে। একমাত্র কয়লা, খনিজ আকরিক ইত্যাদি কিছু পণ্য ছাড়া বাকি সবকিছুতে সড়ক পরিবহণই বেশি বাড়ছে। যেটুকু ভোগ্যপণ্য বা কৃষিপণ্য রেলে যায় তার বেশিরভাগ অংশটাই এখন প্রাইভেট কুরিয়ার কোম্পানি, বহুজাতিক খুচরো ব্যবসার চেনের মালিক ইত্যাদিদের হাতে লিজে তুলে দিয়েছে রেল। এর ফলে একদিকে যেমন পণ্য পরিবহণে খরচ বেড়ে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বাড়ছে, অন্যদিকে রেলকর্মচারী নিয়োগ কমছে। সমস্ত দিক থেকেই আক্রমণটা এসেছে সাধারণ মানুষের উপরই। যাত্রী খাতেও রেল কোনও ভর্তুকি দেয় না। এসি প্রথম শ্রেণি থেকে এসি চেয়ার কারের মতো উচ্চশ্রেণির ক্ষেত্রে ভর্তুকি তো দূরের কথা মাঝে মাঝে 'প্রিমিয়াম তৎকালের' জেরে এর ভাড়া বিমান ভাড়াকে ছাপিয়ে যাচ্ছে। সাধারণ স্লিপার শ্রেণির জন্যও নানা অজুহাতে বাড়তি ভাড়া চাপিয়ে দিয়ে রেল যথেষ্ট লাভ করছে। এখন মেল-এক্সপ্রেস ট্রেনগুলিতে দ্বিতীয় শ্রেণির সাধারণ কামরা কমতে কমতে প্রায় বিরল হয়ে উঠেছে। সেই সব কামরায় মানুষকে যেভাবে গাদাগাদি করে যাতায়াত করতে হয়, তাতে এই প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক যে, সরকার তথা রেল কর্তৃপক্ষ এঁদের আদৌ মানুষ বলে গণ্য করেন কি না! শহরতলির ট্রেনে ডেইলি টিকিট এবং মান্থলি টিকিটে ক্রশ সাবসিডি বা এক জায়গার লাভ থেকে অন্য জায়গায় ভর্তুকি দেওয়ার কথা রেল বলে থাকে। এ ক্ষেত্রে কোনও জনমুখী সরকারের কী দৃষ্টিভঙ্গি হওয়া উচিত? এ দেশের কোটি কোটি শ্রমজীবী মানুষ শহরতলির ট্রেনে করে কর্মক্ষেত্রে যান, মানুষের নিত্যপ্রয়োজনীয় সবজি, মাছ ইত্যাদি এই লোকাল ট্রেনে স্থানীয় বাজার থেকে শহরে পৌঁছায়। লোকাল ট্রেনে সহজে এবং কিছুটা সস্তায় এই শ্রমজীবী মানুষ যাতায়াত করতে না পারলে গ্রাম-শহরের অর্থনীতিই ভেঙে পড়বে। শহর তার কাজের লোক পাবে না। মানুষের রোজগার কমে বাজারের সংকট আরও বাড়বে। এই পরিস্থিতিতে যে কোনও জনকল্যাণমুখী রাষ্ট্রে সরকারের কর্তব্য শহরতলির রেল, মেট্রো রেলের মতো পরিষেবা যথাসম্ভব সস্তা, দ্রুত করে তোলা এবং যাত্রীস্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করা, যাতে যাতায়াত করতে গিয়েই শ্রমজীবী মানুষের প্রাণশক্তি নিঃশেষিত হয়ে না যায়। বিজেপি সরকারের রেলবাজেটের দৃষ্টিভঙ্গি ঠিক এর বিপরীত।

যাত্রী সুরক্ষার অবস্থা কী? রেলমন্ত্রী তো রাত্রে প্রার্থনা করেই খালাস। কিন্তু রেলযাত্রা যে আক্ষরিক অর্থেই প্রাণ হাতে করে যাত্রা হয়ে উঠেছে তা সাধারণ রেলযাত্রী মাত্রেই জানেন। মন্ত্রীমশাই পরিসংখ্যান দিয়ে বলেছেন, বিগত বছরে রেল অ্যাক্সিডেন্ট কমে বছরে মাত্র ১০০টিতে দাঁড়িয়েছে। মন্ত্রীমশাই এই হিসাব নিয়ে সুখে থাকতে পারেন, কারণ তাঁকে তো আর ট্রেনে যাতায়াত করতে হয় না। এবারের অর্থনৈতিক সমীক্ষায় সরকার দেখিয়েছে ২০১৮তে একটিও সংঘর্ষ হয়নি। অথচ এই সময়ের মধ্যেই যে একাধিক ট্রেন বেলাইন হয়ে শতাধিক যাত্রীর মৃত্যু ঘটেছে তা চেপে গেছে সরকার। রেলের লাইন পেরোতে গিয়ে, বা অরক্ষিত লেভেল ক্রশিংয়ে গত তিন বছরে ৫০ হাজার লোকের মৃত্যু হয়েছে (নিউজ ১৮, অক্টোবর ২৩, ২০১৮)। ১৬০০-র বেশি মানুষ রেলভ্রমণকালে অসুস্থ হয়ে বিনা চিকিৎসায় মারা গেছেন। সরকার এগুলি উল্লেখই করেনি। রেলকামরায় ডাকাতি, চুরি, পকেটমারি, মহিলাদের শ্লীলতাহানি কত হয়েছে সে তথ্য সরকার দিচ্ছে না। যদিও যাত্রীদের অভিজ্ঞতা বলছে এসব বেড়েছে মারাত্মকভাবে। অর্থাৎ পুরো দৃষ্টিভঙ্গিটাই অস্বচ্ছতা এবং শঠতায় ভরা। রেলমন্ত্রী ৫ হাজার ৬৯০ কোটি টাকা রেলসুরক্ষা খাতে বরাদ্দের কথা বলেছেন। অথচ তিনি উল্লেখ করলেন না যে, ২০১৭ সালে অরুণ জেটলির বাজেটে ১ লক্ষ কোটি টাকা এবং ২০১৮তে নতুন করে যে ২০ হাজার কোটি টাকা রাষ্ট্রীয় রেল সুরক্ষা তহবিল জনগণের ঘাড় ভেঙে তোলার কথা বলা হয়েছিল সে টাকা কোথায় গেছে? কার সুরক্ষায় লেগেছে সে টাকা?

রেলের ১৪ লক্ষ কর্মচারী, তাঁদের পরিবারের প্রায় ৭০ লক্ষ মানুষের ভবিষ্যৎও আজ মারাত্মক বিপদের মধ্যে পড়েছে। এ দেশে রেলব্যবস্থাকে বিশ্বমানের জায়গায় নিয়ে যাওয়ার যে দাবি সরকার করছে, তার যতটুকু বাস্তবে হয়েছে, সে কাজ করেছেন কারা? রেলের এই কর্মচারীরাই তো! অথচ তাঁদের বিদায় দিয়ে চুক্তিভিত্তিক অস্থায়ী কর্মচারী এবং বেসরকারি কন্ট্রাক্টররাই এখন সরকারের ভরসা। তাদের দায়বদ্ধতা কোথায়? আমাদের দেশে সড়ক নির্মাণে এই কন্ট্রাক্টর প্রথা এবং তার নিম্নমান কি কোনও অজানা বিষয়? বহুজাতিক যে কোম্পানিগুলি রেলের জমিকে কাজে লাগিয়ে অপটিক্যাল ফাইবার কেবল কিংবা শপিং মলে বিনিয়োগ করবে তাদেরও দায়বদ্ধতা থাকার কোনও প্রশ্নই নেই। তারা টাকা ঢালবে, লাভ তুলে নিয়ে পাততাড়ি গোটাবে। বিপন্ন হবে দেশের সাধারণ মানুষের স্বার্থ।

বিজেপি সরকারের শঠতাপূর্ণ রেল বাজেট থেকে একমাত্র এই বিপন্নতাই প্রাপ্তি হয়েছে মানুষের।

বিজেপি ঃ প্রশ্ন ইতিমধ্যেই

একের পাতার পর

হতাশ করেছে। কিন্তু বাজেট কি সবাই এমন বোঝেন নাকি যে, তা দেখে তাঁরা হতাশ হয়ে পড়েছেন? না, বাজেটের খুঁটিনাটি সবাই হয়ত বোঝেন না, কিন্তু তার প্রত্যক্ষ ফল টের পেতে অনেকেরই দেরি হয়নি। যেমন, শিক্ষিত মধ্যবিত্ত অংশ, যারা খানিকটা রোজগার করেন, তাঁরা দেখলেন দ্বিতীয় দফার বিজেপি সরকারের বাজেটে তাঁদের জন্য প্রত্যক্ষ পাওনা গোল্লা। আয়করে কোনও রেহাই মিলল না। অথচ দেশের একচেটিয়া পুঁজিপতিদের জন্য কর্পোরেট কর দিব্যি কমিয়ে দেওয়া হল। বিজেপিকে ভোট দিয়েছে বলে, তার সব কাজকেই আনন্দের সঙ্গে মেনে নিতে হবে— এমন দিব্যি তো কেউ দেয়নি। আবার পেট বড় বালাই। খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষের অনেকেরও আশা ছিল, লাফিয়ে বাড়তে থাকা জিনিসপত্রের দামে সরকার লাগাম পরাবে, নতুন কলকারখানা খোলার কথা ঘোষণা করবে, দেশজুড়ে ছেয়ে থাকা বেকারদের কাজের ব্যবস্থা করবে। কিন্তু গোটা বাজেটে অর্থমন্ত্রী এগুলি নিয়ে একটি কথাও উচ্চারণ করলেন না। উপরন্তু তেলের উপর লিটার পিছু ২ টাকা করে সেস চাপিয়ে আর্থিক সংকটে ধুঁকতে থাকা সাধারণ মানুষের উপর আর এক দফা মূল্যবৃদ্ধি-ভাড়াবৃদ্ধির বোঝা চাপিয়ে দিলেন। জীবনে এগুলির প্রভাব বোঝার জন্য অর্থনীতির পণ্ডিত হতে হয় না। মানুষ বোঝে জীবনের জ্বালায়। তাই তাঁদের আফশোস— কাকে আনলাম!

শিল্পাঞ্চলের যে শ্রমিকরা বিজেপিকে ভোট দিয়েছিলেন, তাঁরা সরকারের একের পর ঘোষণায় নিজেদের প্রতারিত মনে করছেন। বলছেন, এ কাকে সমর্থন করলাম! সরকারে বসেই বিজেপি প্রথমে ৪২টি, পরে আরও ১০টি রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পকে শিল্পপতিদের হাতে তুলে দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছে। রেলের নিজস্ব কারখানাগুলিও একই ভাবে পুঁজিপতিদের হাতে তুলে দিচ্ছে। এর নিশ্চিত পরিণতি বিপুল সংখ্যায় কর্মসংকোচন তথা শ্রমিক-কর্মচারী ছাঁটাই। শুধু তাই নয়, শ্রম আইনে এতদিন শ্রমিকদের জন্য যতটুকু নিরাপত্তার কথা বলা ছিল, সে-সব বদলে নতুন আইন নিয়ে আসছে সরকার যেখানে মালিকদের হাতে শ্রমিক শোষণের অবাধ অধিকার থাকবে অথচ শ্রমিকদের থাকবে না প্রতিবাদ করার অধিকার। বিজেপি নেতা-মন্ত্রীরা নির্বিকার ভাবে বলে চলেছেন, এতে শ্রমিকদের মঙ্গলই হবে। স্বাভাবিক ভাবেই শ্রমিকদের মধ্যে ক্ষোভ বাড়ছে।

দেশে আজ অসংগঠিত শ্রমিক-কর্মচারীর সংখ্যাই বেশি। আশা-অঙ্গনওয়াড়ি-মিড ডে মিল কর্মী, স্বাস্থ্যকর্মী প্রভৃতি হিসাবে লক্ষ লক্ষ নারী-পুরুষ কোনও রকম সুযোগ-সুবিধা ছাড়াই নামমাত্র মাইনেতে বছরের পর বছর ধরে কাজ করে যাচ্ছেন। তাঁদের আশা ছিল, সরকার বাজেটে তাঁদের জন্য অন্তত কিছু ঘোষণা করবে। বাস্তবে তাঁদের জীবনের জ্বালা জুড়োতে কোনও ঘোষণা করেনি সরকার। প্রবল ক্ষুব্ধ এই মানুষগুলি।

বিজেপি কৃষকদেরও একটা অংশের সমর্থন পেয়েছিল। কৃষকদের আশা ছিল, এই সরকার তাদের পরিশ্রমে ফলানো ফসলের ন্যায্য দাম পাওয়ার ব্যবস্থা করবে। সার বীজ কীটনাশকের দাম কমাবে। কোথায় কী! বরং কৃষি ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত প্রতিটি ক্ষেত্রকেই কর্পোরেট পুঁজির হাতে তুলে দেওয়ার ব্যবস্থা পাকা করে ফেলেছে বিজেপি সরকার। মোহ ভাঙছে কৃষকদের।

২০১১ সালে এ রাজ্যের মানুষ সিপিএমকে হঠিয়ে তৃণমূলকে ক্ষমতায় বসিয়েছিল। কিন্তু তৃণমূলের নেতা-মন্ত্রীদের আচরণে সাধারণ মানুষের মনে একটা প্রবল আশাভঙ্গের প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়। চৌত্রিশ বছরের সিপিএম অপশাসন, যা বাংলার বুকে একটা জগদ্দল পাথরের মতো চেপে ছিল, সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামে কৃষকদের জমি দখলের বিরুদ্ধে রাজ্যজুড়ে এক প্রবল গণআন্দোলনের মধ্য দিয়ে সেই সরকারের অবসান ঘটেছিল। আর সিপিএমের বিরুদ্ধে মানুষের ক্ষোভকে কাজে লাগিয়ে ক্ষমতায় বসেছিল তৃণমূল সরকার। মানুষ আশা করেছিল, দুর্নীতি, তোলাবাজি, গা-জোয়ারি এসব বন্ধ হবে। রাজ্যে একটা পরিবর্তন আসবে। কিন্তু পরিবর্তন আসেনি। সিপিএম নেতারা যা করছিলেন, তৃণমূল নেতারাও সেই একই কাজ করতে থাকলেন। অনেক ক্ষেত্রে ব্যক্তিগুলিও একই থাকল। যারা এক সময় সিপিএমের হয়ে লুটপাট চালাত, কাটমানি তুলত, তারা দ্রুত তৃণমূলে ভিড়ে গিয়ে নেতা হয়ে বসল। তৃণমূল নেতৃত্ব কিন্তু ভোট রাজনীতির স্বার্থে তাদের আটকানোর চেষ্টা করলেন না। ফলে লুটপাট যেমন চলছিল তেমনই চলতে থাকল। ক্ষুব্ধ মানুষ আবার একটা পরিবর্তনের জন্য যখন ছটফট করছে তখনই বিজেপিকে প্রচার দিয়ে দিয়ে সামনে নিয়ে এল দেশের পুঁজিপতি শ্রেণি।

আজ যতই বিজেপির স্বরূপ প্রকাশ পাচ্ছে ততই মানুষের মনে তাদের সম্পর্কে নানা প্রশ্ন উঠছে। মানুষ দেখছে, বিজেপির নেতা হয়ে যারা বসছে, তাদের বেশিরভাগটাই তৃণমূল থেকে বিতাড়িত কিংবা ভাগ-বাটোয়ারা মনের মতো না হওয়ার দ্বন্দ্বে তৃণমূল ছেড়ে আসা। একটা অংশ সিপিএম থেকে আসা। স্বাভাবিকভাবেই তাদেরও অতীত রেকর্ড যথেষ্ট কালিমাখানো। তা হলে এরা তৃণমূলকে শিক্ষাটাই বা দেবে কী, আর

সাতের পাতায় দেখুন

কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষা থেকে

৫ই আগস্ট এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক, এ যুগের বিশিষ্ট মার্কসবাদী চিন্তানায়ক ও দার্শনিক, সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের ৪৪তম স্মরণদিবস। এই উপলক্ষে তাঁর রচনার একটি অংশ প্রকাশ করা হল।

"এই যে সাংস্কৃতিক অবক্ষয় দেখছেন, এটা একটা 'অ্যাক্সিডেন্ট' নয়। 'স্পনটেনিয়াস' (স্বতঃস্ফূর্ত) 'সামথিং' (কিছু একটা) নয়। এমন একটা ব্যাপার নয়, যেটা পূর্ব নির্ধারিত একটা 'ফ্যাটালিস্টিক' (অবশ্যম্ভাবী) ঘটনা — যেন হওয়ারই কথা ছিল, যেটা হবেই এবং তাই হচ্ছে। গভীরে গিয়ে দেখলে ধরা পড়বে, যদিও এটা ঘটছে লোকচক্ষুর অন্তরালে তবুও এর পিছনে রয়েছে শাসক সম্প্রদায়ের একটা পরিকল্পনা এবং প্রশ্রয়। মানুষকে এরা মুখে বলছে সৎ হও, ভাল হও। অথচ 'প্র্যাকটিক্যাল পলিটিকস'-এর (বাস্তব রাজনীতির) দোহাই দিয়ে ক্ষুদ্র পার্টিস্বার্থে শুধু আশু প্রয়োজনটাকে সামনে রেখে, শাসকদলই শুধু নয়, বিপ্লবের তকমাধারী অনেক দলই মানুষের মধ্যে যে নীচ প্রবৃত্তিগুলো রয়েছে তাকে বাড়িয়ে দিচ্ছে।

কাপুরুষোচিত আক্রমণের প্রবৃত্তিকে, দশজনে মিলে একজনকে মারার হীন কার্যকলাপকে, তত্ত্ব আলোচনা যুক্তিবিচারের বদলে অসহিষ্ণুতা প্রভৃতিকে সংগ্রাম ও লড়াই-এর নামে প্রশ্রয় দেওয়া হচ্ছে। লোভ-লালসা ও নীচতা, যা একটা মানুষকে অমানুষ করে, তার বীরত্ব এবং যথার্থ মর্যাদাবোধকে নষ্ট করে দেয়, তাকেই আজ প্রশ্রয় দেওয়া হচ্ছে। টাকার বিনিময়ে কর্মীদের দিয়ে পার্টির বা ইউনিয়নের নিয়মিত কাজ করানো হচ্ছে এবং নির্বাচনের কাজ করানো হচ্ছে। এ সবই চলছে আজ বাস্তব রাজনীতির দোহাই দিয়ে। লক্ষ লক্ষ বেকারে আজ সারা দেশ ভরে গেছে, পেট চলছে না মানুষের। সেই সুযোগে এই রাজনৈতিক দলগুলি তাদের ব্যবহার করছে, এইভাবেই তাদের 'এমপ্লয়মেন্ট' (চাকরি) দিচ্ছে ! আপনারা জানেন যে, সব মানুষই দোষে গুণে মিশিয়ে মানুষ। মানুষের মধ্যে যে সমস্ত ভাল দিক রয়েছে অর্থাৎ তার মধ্যে যে সব ভালর দিক— সাহস, বীরত্ব, সহানুভূতি, উদারতা ও কর্তব্যের দিক রয়েছে, সেই দিকগুলোকে বাড়াতে সাহায্য করেই একমাত্র তার দোষকে দূর করা যায়। শুধুমাত্র দোষকে দূর হতে বললেই তা দূর হয়ে যায় না, বা মানুষকে সৎ হও, ভাল হও বললেই মানুষ সৎ ও ভাল হয় না। অথচ একদিকে সৎ হও, ভাল হও বলে এই উপদেশ আর অন্য দিকে বাস্তব রাজনীতির দোহাই পেড়ে যারা বা যে দলই হোক না কেন, বুকনি তাদের যাই হোক না কেন— মানুষের মধ্যে নীচ প্রবৃত্তিগুলোকে উস্কানি দিয়ে এবং এর দ্বারা তারা জেনে হোক, না জেনে হোক, নিজেরা ব্যক্তিগতভাবে সৎ হোন বা অসৎ হোন সেটা অত বড় প্রশ্ন নয়, এর দ্বারা তারা আসলে গোটা দেশের সাংস্কৃতিক পরিবেশকে, জাতির নৈতিক চরিত্রকে ধ্বংস করার বুর্জোয়া শ্রেণির যে ষড়যন্ত্র তাকে সফল হতে সাহায্য করছেন।"

— 'শ্রমিকের কাছে সর্বহারা রুচি সংস্কৃতি তুলে ধরতে হবে'
নির্বাচিত রচনাবলি, তৃতীয় খণ্ড

দাভোলকরদের হত্যার পিছনে হিন্দুত্ববাদীরাই, কবুল খোদ হত্যাকারীর

২০১৩-র ২০ আগস্ট মহারাষ্ট্রের পুনেতে খুন হন কুসংস্কারবিরোধী আন্দোলনের অন্যতম নেতা নরেন্দ্র দাভোলকর। এর পর একের পর এক যুক্তিবাদী সত্যসন্ধানী মানুষের পরিকল্পিত হত্যায় শিউরে উঠেছে দেশ। ২০১৫-র ফেব্রুয়ারিতে বিজ্ঞান আন্দোলনের নেতা গোবিন্দ পানসারে, ওই বছরেরই আগস্টে কর্ণাটকের হাম্পি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, সাহিত্য আকাডেমি পুরস্কারপ্রাপ্ত লেখক এম এম কালবুর্গি এবং ২০১৭-র সেপ্টেম্বরে বেঙ্গালুরুতে খুন হন প্রতিবাদী সাংবাদিক গৌরী লঙ্কেশ। সম্প্রতি গ্রেপ্তার হওয়া এক অভিযুক্ত নিজেই পুলিশের কাছে কবুল করেছে, সংঘ পরিবারের ঘনিষ্ঠ উগ্র হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসীরাই এই হত্যা-ষড়যন্ত্রের হোতা। অন্ধ কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লড়াকু যুক্তিবাদীদের একের পর এক নিকেশের এই নৃশংস ঘটনাগুলি যে একই সুতোয় বাঁধা— সেই সন্দেহে সিলমোহর পড়ল এই স্বীকারোক্তিতে।

গত অক্টোবরে বেআইনি অস্ত্র রাখার অভিযোগে মহারাষ্ট্রে অ্যান্টি-টেরর স্কোয়াড (এটিএস) গ্রেপ্তার করে শরদ কালাসকর নামে সংঘ পরিবার ঘনিষ্ঠ এক দুষ্কৃতীকে। জেরায় বেরিয়ে আসে বেঙ্গালুরুতে সাংবাদিক গৌরী লঙ্কেশের হত্যাকাণ্ডের পিছনে থাকা হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসীদের সঙ্গে তার যোগাযোগের কথা। সেই সূত্রে কর্ণাটক পুলিশ নতুন করে জেরা করে শরদকে। পুলিশের কাছে ১৪ পৃষ্ঠার একটি জবানবন্দি দেয় শরদ। সম্প্রতি সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে হাড় হিম করা সেই বয়ান।

পুলিশের কাছে শরদ বর্ণনা দিয়েছে, ২০১৩ সালের ২০ আগস্ট ভোরে পুণে শহরের ওঙ্কারেশ্বর সেতুতে কীভাবে দু'বার গুলি চালিয়ে সে খুন করে কুসংস্কারবিরোধী আন্দোলনের নেতা ৬৭ বছরের নরেন্দ্র দাভোলকরকে। পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রথমে শরদ পিছন থেকে দাভোলকরের মাথায় গুলি করে। রক্তাপ্লুত দাভোলকর মাটিতে পড়ে গেলে আবার গুলি চালায়। এবার তাঁর ডান চোখ লক্ষ্য করে। তার আরেক সঙ্গী শচীন আন্দুরেও গুলি চালায়।

শরদ কালাসকর জানিয়েছে, উগ্র হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসী গোষ্ঠী 'সনাতন সংস্থা'র এক নেতা বীরেন্দ্র তাওড়ে তাকে বুঝিয়েছিলেন, 'হিন্দুদের শত্রু কয়েকজন ধর্মবিরোধী শয়তান'কে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়া দরকার। দাভোলকর হত্যায় তাওড়ের নির্দেশ ও পরিকল্পনা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিল শরদ। দাভোলকর হত্যার পর এই তাওড়েই শরদকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন অমল কালের সঙ্গে। কে এই অমল কালে? সনাতন সংস্থা অনুমোদিত 'হিন্দু জনজাগৃতি সমিতি'র সদস্য অমল কালেও ছিল দাভোলকর হত্যা ষড়যন্ত্রের অন্যতম অংশীদার। পরে পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে এবং তদন্তে বেরিয়ে আসে, গৌরী লঙ্কেশ এবং পানসারে হত্যার পিছনেও তার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল।

শরদ কালাসকর তার স্বীকারোক্তিতে আরও জানিয়েছে, উগ্র হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসীদের সঙ্গে বেশ কয়েকবার বৈঠকে বসে সে। সেখানে ধর্মীয় অন্ধতা, নোংরা জাত-পাতের বিচার, কুসংস্কার আর ঠগবাজ বাবাজি-মাতাজি-জ্যোতিষীদের অপকর্মের বিরুদ্ধে দাভোলকর, পানসারে, কালবুর্গিদের মতো আন্দোলনকারীদের 'হিন্দুধর্ম বিরোধী শত্রু' হিসাবে দেগে দেওয়া হয়। তার কথায়, "২০১৬-র আগস্টে বেলগামে এক বৈঠকে হিন্দু ধর্মবিরোধীদের কয়েকজনকে চিহ্নিত করা হয়। সেই বৈঠকেই গৌরী লঙ্কেশের নাম উঠে আসে এবং সিদ্ধান্ত হয় তাঁকে খুন করা হবে।" এক বছর পরে অন্য একটি বৈঠকে গৌরী লঙ্কেশ হত্যার চূড়ান্ত পরিকল্পনা তৈরি হয় এবং সেই দায়িত্ব কয়েকজন উগ্র হিন্দুত্ববাদী দুষ্কৃতীকে বুঝিয়ে দেওয়া হয়। লঙ্কেশ হত্যার পর কর্ণাটকের বিজেপি বিধায়ক ডি এন জিভারাজ চরম ঔদ্ধত্যে মন্তব্য করেন, আরএসএস-বিজেপির বিরুদ্ধে মুখ না খুললে গৌরী লঙ্কেশকে মরতে হত না। কালাসকরের স্বীকারোক্তি থেকে জানা গেছে, তাদের পরবর্তী টার্গেট ছিলেন বম্বে হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি এসইজেড বিরোধী আন্দোলনের নেতা বি জি কোলসে পাতিল।

এবারের লোকসভা নির্বাচনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও বিজেপি সভাপতি অমিত শাহ মালেগাঁও বিস্ফোরণ কাণ্ডে জড়িত উগ্র হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসী প্রজ্ঞা ঠাকুরকে প্রার্থী দাঁড় করানোয় দেশের মানুষ স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। তখনই প্রশ্ন উঠেছিল, যারা মুখে সন্ত্রাসবাদের বিরোধিতা করে, তারা প্রজ্ঞা ঠাকুরের মতো একজন সন্ত্রাসীকে প্রার্থী করে কী করে? নিজেদের সমর্থনে মোদিরা বলেছিলেন, সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে নাকি হিন্দুধর্মকে জড়ানোই সম্ভব নয়। কেবলমাত্র হিন্দুদের অপমান করার জন্যই নাকি প্রজ্ঞা ঠাকুরদের উগ্র হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসীর তকমা দেওয়া হয়েছে। এই দাবি কতখানি অসত্য ছিল তা শরদ কালাসকারের স্বীকারোক্তিতেই স্পষ্ট হয়ে গেল। শুধু তাই নয়, এর আগেই মালেগাঁও বিস্ফোরণ মামলার সরকারি আইনজ্ঞের বক্তব্যে সামনে এসে গেছে যে হিন্দু মৌলবাদী গোষ্ঠী বা ব্যক্তির বিরুদ্ধে সন্ত্রাসমূলক কাজকর্মে যুক্ত থাকার অভিযোগ উঠলে ক্ষমতাসীন বিজেপি সরকারের প্রভাবশালী নেতা-মন্ত্রীদের নির্দেশে পুলিশ বা তদন্ত সংস্থাগুলি রীতিমতো 'নরম মনোভাব' নিয়ে চলে, কর্তব্যে গাফিলতি করতে থাকে। একইভাবে এবার খোদ বম্বে হাইকোর্ট যুক্তিবাদীদের হত্যাকাণ্ডগুলির তদন্তে ব্যাপক গাফিলতির অভিযোগ তুলেছে। বোঝাই যায়, অভিযুক্তরা সকলেই উগ্র হিন্দুত্ববাদী সংগঠনের ঘনিষ্ঠ হওয়ায় ক্ষমতাসীন বিজেপি ও সংঘ পরিবারের ইশারাতেই এই গাফিলতি।

স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী এবারের লোকসভা নির্বাচনের আগে সভায় সভায় বক্তৃতা দিয়ে দেশের মানুষকে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার ডাক দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করেছিলেন, তাঁরা এ নিয়ে কত উদ্বিগ্ন। শুধু দেশের মধ্যেই নয়, বিদেশে যখন যেখানে গিয়েছেন, সন্ত্রাসবাদ রুখতে তিনি কত তৎপর তা বোঝাতে ব্যস্ত হয়েছেন। সম্প্রতি দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহও জানিয়ে দিয়েছেন, সন্ত্রাসবাদের ক্ষেত্রে তাঁদের সরকারের নীতি হল 'জিরো টলারেন্স' অর্থাৎ এ জিনিস তাঁরা কোনও ভাবেই সহ্য করবেন না। বিজেপির অন্যান্য নেতা-মন্ত্রীদেরও প্রধানমন্ত্রীর অনুকরণে সন্ত্রাসবাদীদের বিরুদ্ধে প্রায়শই গলা চড়াতে দেখা যায়।

কিন্তু বাস্তবে তাঁরা কেমন সন্ত্রাসবাদ বিরোধী, তা কি দাভোলকর, কালবুর্গিদের হত্যা এবং তার তদন্তে ঢিলেমির ঘটনায় স্পষ্ট হয়ে যায়নি? নাকি সন্ত্রাসবাদ বলতে তাঁরা শুধুই মুসলিম মৌলবাদী সন্ত্রাসবাদ বোঝেন? মালেগাঁও বিস্ফোরণ মামলার বিচারক যথার্থই মন্তব্য করেছিলেন যে সন্ত্রাসবাদীদের কোনও ধর্ম হয় না, জাত হয় না। কোনও ধর্মই তার অনুগামীদের সন্ত্রাসমূলক কার্যকলাপের উপদেশ দেয় না। ধর্ম নির্বিশেষে মানবতার বিরুদ্ধে জঘন্য অপরাধ সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যদি সত্যিই প্রধানমন্ত্রী এবং তাঁর দলের এত ঘৃণা থাকে তাহলে তো যে উগ্র হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলি দেশজুড়ে সন্ত্রাসবাদের রূপকার হিসাবে প্রমাণিত ও চিহ্নিত হয়ে গেল, সেগুলির বিরুদ্ধে এই মুহূর্তে তাঁদের দাঁড়াতে হয়! অবিলম্বে এইসব সংগঠনগুলিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করতে হয়! তা কি তাঁরা করবেন? দেশের সাধারণ মানুষ কিন্তু মোদি-সরকারের কাছে সেই দাবিই করছে। দ্রুত যদি তাঁরা এই পদক্ষেপ না নেন, তাহলে বুঝতে হবে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে তাঁদের যাবতীয় হুঙ্কার স্রেফ আরও একটা 'জুমলা'— একটি বিশেষ ধর্মের সন্ত্রাসীদের দিকে আঙুল তুলে আসলে জনসাধারণকে দেওয়া সমস্ত প্রতিশ্রুতি পালনের ব্যর্থতা ঢাকা দেওয়ার অপচেষ্টা মাত্র। এ কথাও স্পষ্ট হয়ে যাবে, সন্ত্রাসবাদের ধর্ম বিচার করে হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসীদের প্রতি নরম দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে চলেন তাঁরা এবং তাদের জন্য সমস্ত রকম রাষ্ট্রীয় মদতেরও ব্যবস্থা করে দেন। এই মদত একদিকে যে সংবিধানের শপথ নিয়ে তাঁরা সরকারে গেছেন, তাকে যেমন লংঘন করে, তেমনই মানবতার প্রতিও তা চরম অপরাধ।

কমসোমলের উদ্যোগে শিশু-কিশোর উৎসব

ভারতীয় নবজাগরণের প্রাণপুরুষ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের দ্বিশত জন্মবর্ষ উপলক্ষে কমসোমল কলকাতা জেলার উদ্যোগে দ্বিতীয় কলকাতা জেলা শিশু কিশোর উৎসব অনুষ্ঠিত হল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের গান্ধী ভবনে, ৭ জুলাই। বিদ্যাসাগরের পূর্ণাবয়ব প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদনের মধ্য দিয়ে উৎসবের সূচনা হয়। জেলা জুড়ে গত এক মাস যাবৎ প্রস্তুতি চলছিল শিশু কিশোর উৎসবের। ১৮টি দেওয়াল পত্রিকা, ১৫টি সমবেত নৃত্য, ২৪টি নাটকের টিম সহ ছবি আঁকা ও কুইজে অংশগ্রহণ করে ২৮২ জন শিশু কিশোর।

কমসোমলের রাজ্য ইনচার্জ কমরেড সপ্তর্ষি রায়চৌধুরী বলেন, আমরা শিশু কিশোরদের মধ্যে নানা গুণের বিকাশ ঘটাতে এই ধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকি।

স্থায়ী সরকারি লাইসেন্সের দাবি মোটরভ্যান চালকদের

রাজ্যের ৮ হাজারেরও বেশি মোটরভ্যান চালক ৯ জুলাই কলকাতায় বিক্ষোভ দেখান। তাঁদের দাবি— স্থায়ী সরকারি লাইসেন্স দিতে হবে, মোটরভ্যান চালকদের পরিবহণ শ্রমিক হিসাবে স্বীকৃতি দিতে হবে, দুর্ঘটনাজনিত বিমা চালু করতে হবে। বিক্ষোভ মিছিল সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার থেকে শুরু হয়ে রানি রাসমণি অ্যাভিনিউয়ে পৌঁছলে সেখানে বিক্ষোভ সভায় বক্তব্য রাখেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য জৈমিনী বর্মন, জয়ন্ত সাহা, অংশুধর মণ্ডল, তপন দাস, দীপক চৌধুরী, জয় লোধ ও রাজ্য কমিটির সদস্য জগদীশ শাসমল, গৌর মিস্ত্রি, পূর্ণ বেরা, গোপাল দেবনাথ সহ বিভিন্ন জেলার মোটরভ্যান চালকরা।

প্রধান বক্তা ছিলেন এ আই ইউ টি ইউ সি-র রাজ্য সম্পাদক কমরেড দিলীপ ভট্টাচার্য। রাজ্য সম্পাদক কমরেড অশোক দাসের নেতৃত্বে প্রতিনিধি দল পরিবহণ মন্ত্রীর দপ্তর এবং শ্রম মন্ত্রীর দপ্তরে স্মারকলিপি পেশ করেন।

ডাক্তারি ভর্তিতে স্বজনপোষণ ও ব্যাপক দুর্নীতি

তীব্র প্রতিবাদ এ আই ডি এস ও-র

মেডিকেল ও ডেন্টাল কোর্সে ভর্তিতে স্বজনপোষণ ও ব্যাপক দুর্নীতির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে ১ জুলাই রাজ্য স্বাস্থ্য বিশ্ববিদ্যালয়ে অভিভাবক ও নিট উত্তীর্ণ প্রার্থীদের নিয়ে বিক্ষোভ দেখায় এআইডিএসও। স্বাস্থ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৯ জুনের কালা সার্কুলার অবিলম্বে প্রত্যাহার করার দাবি জানিয়ে ভাইস চ্যান্সেলারের কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। সংগঠনের রাজ্য কমিটির সভাপতি ডাঃ মৃদুল সরকার বলেন, 'রাজ্যে এমবিবিএস ও বিডিএস কোর্সে ভর্তির জন্য কাউন্সেলিং প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে। তা সত্ত্বেও ২৭ জুন পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ্য বিশ্ববিদ্যালয় অত্যন্ত অনৈতিকভাবে বিজ্ঞপ্তি জারি করে ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি (এনটিএ)-র কাছে অন্য রাজ্যের ক্যান্ডিডেটদের এই রাজ্যের ৮৫ শতাংশ রাজ্য কোটাতে অন্তর্ভুক্ত করার অনুমতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানায়। এ রাজ্যের ক্যান্ডিডেটদের স্বার্থে কুম্ভিরাশ্রু বর্ষণকারী স্বাস্থ্য অধিকর্তারাই আজ ম্যানেজমেন্ট কোটার ক্যান্ডিডেটদের অত্যন্ত বেআইনিভাবে রাজ্য কোটাতে অন্তর্ভুক্ত করতে ব্যগ্র হয়ে পড়েছেন!

কিন্তু ২৮ জুন এনটিএ সাফ জানিয়ে দেয় যে ভিন রাজ্যের ক্যান্ডিডেটদের স্টেট অফ এলিজিবিলিটি পরিবর্তন করার কোনও এক্তিয়ার তাদের নেই। এটা সম্পূর্ণ রাজ্যের ব্যাপার। তাঁরা আরও বলেন যে, রাজ্যের অল ইন্ডিয়া র‍্যাঙ্কের ভিত্তিতে স্টেট মেরিট লিস্ট প্রকাশ করা উচিত।

বাস্তবে দুর্নীতি রোখার জন্য কাউন্সেলিং প্রক্রিয়া শুরুর পূর্বেই এনটিএ নির্দেশিত স্টেট মেরিট লিস্ট প্রকাশ করা উচিত ছিল। কিন্তু তা না করে রাজ্য স্বাস্থ্য বিশ্ববিদ্যালয় ও স্বাস্থ্য দফতর কাউন্সেলিং প্রক্রিয়ায় সমস্ত গণতান্ত্রিক রীতিনীতিকে বিসর্জন দিয়েছে। উপাচার্য ডাঃ রাজেন পাণ্ডে মানতে বাধ্য হয়েছেন যে বি-ডমিসাইল নিয়ে দুর্নীতি রুখতে স্বাস্থ্য বিশ্ববিদ্যালয় ও স্বাস্থ্য ভবন ব্যর্থ হয়েছে।'

তিনি বলেন, তাঁদের উচিত ছিল আগে থেকে স্টেট মেরিট লিস্ট প্রকাশ করে তার ভিত্তিতে কাউন্সেলিং পরিচালনা করা। অথচ কার্যক্ষেত্রে সেটা বাস্তবায়িত না করার ঘটনা, এ রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার চূড়ান্ত দুর্নীতি ও স্বজনপোষণকে অত্যন্ত নগ্নভাবে সামনে এনে দিয়েছে। রাজ্যের ছাত্রছাত্রী অভিভাবকদের কাছে এর বিরুদ্ধে লাগাতার আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার জন্য সংগঠনের পক্ষ থেকে অনুরোধ জানানো হয়।

গণদাবী পড়ুন ও গ্রাহক হোন

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা - ১০৪ টাকা

ডাকযোগে ঃ ১১৭ টাকা

চিটফান্ডে ক্ষতিগ্রস্তদের প্রতিবাদ সভা

হুগলি জেলার তারকেশ্বরে জয়কেষ্ট বাজারের মোড়ে ও তারকেশ্বর তালপট্টিতে অল বেঙ্গল চিটফান্ড সাফারার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন হুগলি জেলা কমিটির পক্ষ থেকে ২৯ জুন প্রতিবাদ সভা ও মিছিল হয়। সংগঠনের জেলা সম্পাদিকা অমিতা বাগ জানান, সমস্ত চিটফান্ড ক্ষতিগ্রস্তদের টাকা ফেরত সহ ছ'দফা দাবিতে গোটা রাজ্যে আন্দোলন চলছে। গত ২৬ জুন কলকাতার রানি রাসমণি অ্যাভিনিউয়ে বিক্ষোভ সমাবেশের পর মুখ্যমন্ত্রী ও রাজ্যপালের কাছে ডেপুটেশনে তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার সরকারি প্রতিশ্রুতি ছিল। কিন্তু নবান্নে সংগঠনের প্রতিনিধিরা গেলেও মুখ্যমন্ত্রী তাঁদের সাথে সাক্ষাৎ করেননি।

এই অসৌজন্যমূলক আচরণের প্রতিবাদে এ দিন প্রতিবাদ দিবস পালিত হয়। সভায় বক্তব্য রাখেন সংগঠনের জেলা সভাপতি মহাদেব কোলে, প্রফুল্ল মান্না, অমর সামন্ত, দেবদাস চক্রবর্তী, প্রফুল্ল ভৌমিক, তাপস মাইতি প্রমুখ।

ওড়িশার জাজপুরে কৃষকদের ধরনা

অল ইন্ডিয়া কিষাণ খেতমজদুর সংগঠন (এ আই কে কে এম এস)-এর উদ্যোগে ২৪ জুন জাজপুর কালেক্টরেট দপ্তরের সামনে বিক্ষোভ দেখান শত শত চাষি। তাঁদের দাবি গত মে মাসে প্রবল ঘূর্ণিঝড় 'ফণী'তে ক্ষতিগ্রস্ত ফসল, বাড়ি এবং গবাদি পশুর ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। দাবিপত্র প্রদান সহ সমগ্র কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেন কমরেডস অচ্যুত প্রধান, নৃসিংহ মাহান্ত, চৈতালী সাহু, প্রমোদ মল্লিক প্রমুখ।

কিশোরী নিগ্রহে শাস্তির দাবিতে বিক্ষোভ

কলকাতার নেতাজি নগরের বাসিন্দা, পেশায় গৃহশিক্ষক নারী নিগ্রহকারী রাজীব চক্রবর্তীর কঠোর শাস্তির দাবিতে ১০ জুলাই বাঁশদ্রোণী থানায় স্মারকলিপি দিল অল ইন্ডিয়া মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের কলকাতা জেলা কমিটি।

সংগঠনের জেলা সম্পাদক কমরেড রুনা পুরকায়েত বলেন, 'অভিযুক্ত একটি বেসরকারি স্কুলের দশম শ্রেণির এক ছাত্রীকে গুলি করে মেরে ফেলার হুমকি দিয়ে দিনের পর দিন যৌন নিগ্রহ করেছে। আমরা দ্রুত চার্জশিট দেওয়ার জন্য পুলিশকে বলেছি, যাতে আদালত দ্রুত সাজা ঘোষণা করতে পারে।'

তেলে কর ও সেস বাড়িয়ে জনগণের ওপর বোঝা চাপাল বিজেপি সরকার

দেশের কোটি কোটি সাধারণ মানুষের জীবন-জীবিকা আজ বিপন্ন। ভয়ঙ্কর মূল্যবৃদ্ধির আক্রমণে জনজীবন বিধ্বস্ত। এইরকম একটা সংকটজনক পরিস্থিতিতেও কেন্দ্রের বিজেপি সরকার সাম্প্রতিক বাজেটে ফের পেট্রল-ডিজেলের উপর ট্যাক্স ও সেস চাপাল। এর ফলে দু'টিতেই লিটারে প্রায় আড়াই টাকা করে দামবৃদ্ধি হল। এর অনিবার্য পরিণতিতে সাধারণ মানুষের ঘাড়ে চাপল বাড়তি খরচের বোঝা।

বর্তমানে পেট্রল-ডিজেলের দাম নির্ধারিত হয় আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দামের ওপর ভিত্তি করে। তেল উৎপাদনকারী দেশগুলির সংগঠন 'ওপেক'-এর তেল-নীতির পরিবর্তন, আমেরিকার পশ্চিম উপকূলে প্রচুর তেল উত্তোলন সহ বেশ কয়েকটি কারণে ২০১৬ থেকে আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম বার বার কমছে। এই পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে দেশের বাজারেও তেলের দাম কমানো যেত। জনস্বার্থের কথা বিবেচনা করে কেন্দ্রীয় সরকার যদি দেশের বাজারেও তেলের দাম কমিয়ে রাখত, তার সুফল পেত সাধারণ মানুষ। কারণ, পরিবহণের প্রধান উপকরণ হওয়ায় পেট্রল-ডিজেলের দামের উপর বাকি সমস্ত পণ্যের দাম অনেকটাই নির্ভর করে। অথচ সরকার তা করল না। দেখা গেল, দাম কমানো দূরে থাক, ক্রমাগত কর ও সেস বৃদ্ধি করে তেলের দাম বাড়িয়ে চলেছে কেন্দ্রীয় সরকার, যার বোঝা সম্পূর্ণ রূপে বইতে হচ্ছে খেটে-খাওয়া সাধারণ মানুষকে। এও দেখা যাচ্ছে, আন্তর্জাতিক বাজারের ওপর ভিত্তি করে তেলের দাম নির্ধারণের পরিবর্তিত নিয়মের যাবতীয় সুবিধাগুলি একচেটিয়া ভাবে শুষে নিচ্ছে তেলের বৃহৎ ব্যবসায়ী-ডিলার চক্র। অবশ্যই এই চক্রের হিস্যাদার হিসাবে থাকে ভোটসর্বস্ব রাজনৈতিক দলের নেতা-মন্ত্রীরা।

এক দিকে, চাকরি-বাকরি নেই, সরকারি ক্ষেত্রেও লক্ষ লক্ষ পদ বছরের পর বছর খালি পড়ে রয়েছে। অন্য দিকে, চাষি ফসলের ন্যায্য দাম পাচ্ছে না, শ্রমিক ছাঁটাই হয়ে যাচ্ছে। এর উপর লাগাতার জিনিসপত্রের দাম বাড়তে থাকলে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবেন সেই সব অগণিত সাধারণ মানুষ যারা দিন আনে দিন খায়? বিজেপি ও সংঘ পরিবারের ফরমান মেনে শুধু রামনামের ধ্বনি তুললেই কি দু'বেলা দু'মুঠো খেয়ে পরে বাঁচতে পারবেন দেশের এই সিংহভাগ জনতা?

২০১৪ সালে দেশের কেন্দ্রীয় ক্ষমতায় যাওয়ার পর থেকে এই নিয়ে মোট দশ বার পেট্রোল-ডিজেলের উপর ট্যাক্স ও সেস চাপালো বিজেপি সরকার। এই করবৃদ্ধির অজুহাত হিসেবে বিজেপি সরকার বলেছে, এর ফলে সরকারি কোষাগারে বাড়তি আঠাশ হাজার কোটি টাকা আসবে। কিন্তু কী হবে সেই বাড়তি টাকা দিয়ে? সেই টাকা দেশের নিরন্ন-বুভুক্ষু মানুষের কাজে কীভাবে ব্যবহৃত হবে? তার কোনও ব্যাখ্যা সরকার দেয়নি। বাস্তবে তাদের কোনও ব্যাখ্যা নেইও। দেশের ভাল করার কথা বলে পুঁজিপতিদের ধামাধরা সরকারগুলি আদতে কাদের ভাল করে, দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় সে কথা বুঝতে বাকি নেই সংখ্যাগরিষ্ঠ খেটে-খাওয়া মানুষের। কোটি কোটি জনতার রক্ত শুষে সরকারের কোষাগারে যে অর্থ সঞ্চিত হয় তা তো নানা পথে শেষপর্যন্ত চলে যায় দেশি-বিদেশি কর্পোরেট মালিকদের ঘরেই— করছাড় আর ব্যাঙ্কের শোধ না হওয়া বিপুল ঋণ মেটাতে! গরিব-মধ্যবিত্তকে সেই হা-হুতাশ করেই কাটাতে হয়, আর অপেক্ষা করতে হয় 'দেশপ্রেমিক'দের তৈরি করা আবার একটা নতুন ফাঁদে পড়ার জন্য। জনগণের সাথে ভোটবাজ রাজনৈতিক দলগুলির দীর্ঘ দিনের এই জালিয়াতি বন্ধ হতে পারে, মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে গড়ে ওঠা ঐক্যবদ্ধ ও লাগাতার আন্দোলনকে আরও শক্তিশালী করার মধ্য দিয়ে।

'রামনাম' হাতিয়ার করে বেপরোয়া সন্ত্রাস চালাচ্ছে হিন্দুত্ববাদীরা

বিজেপি জোট শাসিত রাজ্য ঝাড়খণ্ডে সম্প্রতি পিটিয়ে মারা হল তবরেজ আনসারি নামে এক যুবককে। এই নিয়ে ১৩ জন মানুষ ঘৃণ্য সাম্প্রদায়িক রাজনীতির শিকার হলেন এক ঝাড়খণ্ড রাজ্যেই। হাত-পা ল্যাম্পপোস্টে বেঁধে 'জয় শ্রীরাম', 'জয় হনুমান' হুঙ্কারে ১৮ ঘণ্টা ধরে অত্যাচার চালানো হয় ওই যুবকের উপর। হাড় হিম করা সন্ত্রাস চালানোর দীর্ঘক্ষণ পরে সরাইকেলা-খরসোঁয়া জেলার এক গ্রাম থেকে মৃতপ্রায় ওই যুবককে পুলিশ উদ্ধার করলেও তাঁর কোনও চিকিৎসার ব্যবস্থা তারা করেনি। পুলিশি হেফাজতেই মৃত্যু হয় ওই যুবকের।

পশ্চিমবঙ্গেও একই ঘটনা প্রত্যক্ষ করলাম আমরা। সাম্প্রতিক লোকসভা নির্বাচনে কিছু আসন জেতার পর থেকেই বিজেপি-আর এস এস সহ বিভিন্ন হিন্দুত্ববাদী সংগঠনের পক্ষ থেকে লোকজনকে রাস্তায় রাস্তায় 'জয় শ্রীরাম' স্লোগান দিতে বাধ্য করার জন্য জবরদস্তি চালানো হচ্ছে। কয়েকদিন আগে ক্যানিং লোকাল ট্রেনে ঘটল একই ঘৃণ্য ঘটনা। 'হিন্দু সংহতি' সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত একদল মত্ত যুবক এক মাদ্রাসা-শিক্ষকের উপর চড়াও হয়। তাঁর মাথার টুপি ও দাড়ি নিয়ে কটূক্তি করে তাঁকে 'জয় শ্রীরাম' বলার জন্য নির্যাতন চালাতে থাকে। চোখে মুখে ঘুঁষি মেরে পাকিস্তান যাবার ফতোয়া দেয়। তারপর পার্কসার্কাস স্টেশনে চলন্ত ট্রেন থেকে তাঁকে ঠেলে ফেলে দেয়।

কী দোষ ছিল তবরেজ আনসারি বা ওই শিক্ষকের? অপরাধ তাঁদের একটাই— তাঁরা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত ও মুসলিম ধর্মাবলম্বী। ভারতকে হিন্দুরাষ্ট্র বানানোর যে লক্ষ্য নিয়ে বিজেপি চলছে, তাতে তারা মনে করে অহিন্দু সকলকে হিন্দুদের পদানত হয়ে থাকতে হবে। সেই উদ্দেশ্যে সংখ্যালঘুদের মধ্যে ভীতি জাগাতেই এই আক্রমণ। বিগত পাঁচ বছর কেন্দ্রের ক্ষমতায় থাকাকালীন বিজেপির এই চরম হিন্দুত্ববাদী রাজনীতির শিকার হতে হয়েছে অসংখ্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষকে। ২০১৪-র লোকসভা নির্বাচনে জিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি স্লোগান দিয়েছিলেন, 'সবকা সাথ, সবকা বিকাশ', ২০১৯-র লোকসভা নির্বাচন জিতে এর সাথে যুক্ত করলেন, 'সবকা বিশ্বাস'।

এই স্লোগান তুলে তিনি সংখ্যালঘুদের বিশ্বাস বা আস্থা অর্জনের যে কথা বলছেন তা চূড়ান্ত ভণ্ডামিতে পূর্ণ। বাস্তবে ভোটে জিতে নতুন উদ্যমে নতুন শক্তিতে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির নখদন্ত মেলে ধরতে উদ্যত প্রধানমন্ত্রীর দল। এ দেশে সংখ্যালঘুদের অধিকার সুনিশ্চিত বলে প্রধানমন্ত্রী যতই বাগাড়ম্বর করুন, প্রকৃত চিত্রটা সম্পূর্ণ ভিন্ন। সম্প্রতি আন্তর্জাতিক ধর্মীয় স্বাধীনতা সংক্রান্ত মার্কিন বিদেশ দফতরের এক রিপোর্টেও বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে। ধর্মীয় হানাহানি, উগ্র জাতীয়তাবাদ যে ভারতের মতো বহু ধর্মীয়, বহু ভাষাভাষী দেশে স্বাধীনতার ক্ষেত্রটিকে খর্ব করেছে— তা রিপোর্টে বলা হয়েছে। গুজরাট, উত্তরপ্রদেশের মতো দশটি রাজ্যের নাম উল্লেখ করে রিপোর্টে দেখানো হয়েছে, ওই রাজ্যগুলিতে পরিকল্পিতভাবে সংখ্যালঘুদের উপর হামলা চালানো হয়। কখনও গো-রক্ষার নামে, কখনও 'ঘরে ফেরানোর' নামে চলছে মুসলিম ও দলিত হিন্দুদের ওপর আক্রমণ ও হত্যা।

কেন সাম্প্রদায়িকতাকে হাতিয়ার করা? কারণ বিগত ৫ বছর শাসন ক্ষমতায় থেকে দেওয়া প্রতিশ্রুতিগুলোর একটিও রক্ষা করেনি প্রধানমন্ত্রীর দল। দেশ জুড়ে বেকারি, মূল্যবৃদ্ধি, ছাঁটাই, নারী নির্যাতন, কৃষকের আত্মহত্যা প্রভৃতি ব্যাপক রূপ ধারণ করেছে। উন্নয়নের কথা বলে ভোটে জিতলেও উন্নয়ন তো দূরের কথা মানুষ আজ বেঁচে থাকার সমস্ত সুযোগ ও অধিকারগুলি থেকে বঞ্চিত।

বিপরীতে উন্নয়ন হয়েছে এ দেশের মালিক— টাটা, বিড়লা, আম্বানি, আদানিদের। এই মালিকরাই ভোটে জেতার জন্য বিজেপিকে হাজার হাজার কোটি টাকা দিয়েছে। ফলে মালিকদের মুনাফার পাহাড় আরও স্ফীত করার উদ্দেশ্যেই নরেন্দ্র মোদি এবারেও ক্ষমতায় বসেই রাষ্ট্রায়ত্ত কলকারখানা সহ রেল, বিমান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য সমস্ত ক্ষেত্রগুলিকে মালিকদের মুনাফা লুঠের মৃগয়া ক্ষেত্রে পরিণত করতে চাইছে বিজেপি সরকার। আর মানুষের অবস্থা ক্রমাগত নিচের দিকে নামছে।

মানুষ চাইছে এই শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণ পেতে। মানুষের ক্ষোভ যাতে বিজেপি বা সরকারের উপর ফেটে না পড়ে, তার জন্য জাত-পাত-ধর্ম-বর্ণ-ভাষা প্রভৃতিকে ভিত্তি করে মানুষে মানুষে বিভেদ সৃষ্টি করতে চাইছে, যাতে মানুষ ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে, সংগঠিত প্রতিবাদে সামিল না হতে পারে। গরিব-মেহনতি মানুষকে একে অপরের শত্রু বানিয়ে আসল শত্রু এই শোষণমূলক পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থাকে আড়াল করতে চাইছে অত্যন্ত সুচতুরভাবে।

তবরেজ আনসারির হত্যা বা ক্যানিং লোকাল ট্রেনে মুসলিম ধর্মাবলম্বী শিক্ষকের নিগ্রহে অপরাধীদের শাস্তি হবে কি না কেউ জানে না। শাস্তি না পাওয়াই স্বাভাবিক। দিল্লির কাছে দাদরি গ্রামে মহম্মদ আখলাককে মিথ্যা গুজবে যারা হত্যা করেছিল, গত লোকসভা নির্বাচনে এক সভায় তাদের দেখা গেল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বিজেপি সভাপতি অমিত শাহের সাথে। এই অপরাধীরা বিজেপি-আর এস এসের সম্পদ। ফলে ন্যায়বিচারের কোনও আশা নেই। চাই এর বিরুদ্ধে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের সম্মিলিত প্রতিবাদ।

কেরালায় পুলিশের হাতে বিপুল ক্ষমতা তুলে দেওয়ার প্রতিবাদ

আইনশৃঙ্খলা রক্ষার অজুহাতে কেরালার সিপিএম সরকার সম্প্রতি পুলিশের হাতে জেলাশাসকের সমান ক্ষমতা তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এর প্রতিবাদ করে এস ইউ সি আই (সি)-র কেরালা রাজ্য সম্পাদক ডঃ ভি ভেনুগোপাল এক বিবৃতিতে বলেছেন, এই সিদ্ধান্ত মানবাধিকারের চূড়ান্ত বিরোধী।

এর প্রতিবাদে কেরালায় গণআন্দোলনের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা জনকিয়া প্রতিরোধ সমিতি এবং ডেমোক্রেটিক ল-ইয়ারস ফোরাম যৌথভাবে ১১ জুলাই এর্নাকুলামে এক প্রতিবাদ সভার ডাক দেয়। অ্যাডভোকেট কালীশ্বরম, জনকিয়া প্রতিরোধ সমিতির জেলা সম্পাদক ফ্রান্সিস কালাথুঙ্গাল, টি কে সুধীরকুমার প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। বক্তারা বলেন, যতটুকু ক্ষমতা পুলিশের হাতে রয়েছে তাতেই পুলিশ কর্তৃক মানবাধিকার লংঘনের ঘটনা ক্রমে বেড়ে চলেছে। পুলিশ দিয়ে জনগণের গণতান্ত্রিক আন্দোলনগুলি দমন করা হচ্ছে। যে সব রাজ্যে পুলিশ কমিশনারেট তৈরি করে পুলিশের হাতে জেলাশাসকের সমান ক্ষমতা তুলে দেওয়া হয়েছে, সেখানে গুরুতর পুলিশি অত্যাচারের অভিযোগ উঠেছে।

তাঁরা আরও বলেন, বামপন্থী আন্দোলনের দীর্ঘদিনের দাবি, পুলিশবাহিনীর গণতন্ত্রীকরণ করে তাকে সভ্য সমাজের উপযুক্ত করে তুলতে হবে। পুলিশি হেফাজতে অত্যাচারের শিকার হয়ে অভিযুক্তদের আত্মহত্যা ও মৃত্যুর ঘটনা কেরালাতেও বেড়ে চলেছে। পুলিশ যে কোনও লোককে 'মাওবাদী' বলে দাগিয়ে দিয়ে ভুয়ো সংঘর্ষে হত্যা করছে এই অভিযোগ বারবার উঠছে। ক্রিমিনালবাহিনীর সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে তাদের নানা দুষ্কর্মে অংশ নেওয়ার অভিযোগও শোনা যাচ্ছে। সরকারের এই পদক্ষেপ পুঁজিবাদী রাষ্ট্রযন্ত্রের দমন-পীড়নের ক্ষমতারই শক্তিবৃদ্ধি ঘটাবে যা নিজেকে 'বামপন্থী' বলে দাবি করা একটি সরকারের পক্ষে গভীর লজ্জার।

পাঠকের মতামত

ডাক্তার আন্দোলন

২৮ জুন সংখ্যার গণদাবীতে পাঠকের মতামত শীর্ষকে প্রকাশিত 'তা হলে আন্দোলনই একমাত্র পথ' সম্পর্কে এই চিঠি।

শুধু লেখাটির নামকরণের মধ্য দিয়ে যে বার্তাটি আসে তাকে আমি পুরোপুরি সত্য বলে মনে করি। লেখাটি জনৈক পাঠকের হলেও যেহেতু গণদাবীতে ছাপানো হয়েছে তাতে ধরে নেওয়া যেতে পারে গণদাবীর সম্পাদকমণ্ডলীরও মতামত এটাই এবং আপনারা জুনিয়র ডাক্তারদের আন্দোলনের জয়ে যারপরনাই আনন্দিত। এখানে আমি ভেবে দেখতে অনুরোধ করছি আপনারা এই সস্তা জয়ে তৃপ্ত হয়ে একটা ব্যাপক এবং অত্যন্ত প্রয়োজনীয় আন্দোলনকে ভ্রূণাবস্থায় খুন করলেন, অন্তত সেই আন্দোলনকে আরও সংকটময় অবস্থায় পৌঁছে দিলেন।

আমার বক্তব্যের সমর্থনে কিছু বলার আগে সেদিনের ঘটনাটা একবার মনে করে নেওয়া যাক। একজন অসুস্থ লোককে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ভিজিটিং আওয়ারে তাঁর পরিজনদের সামনে অসুস্থ লোকটির অবস্থার অবনতি হয়। একজন ডাক্তার এসে তাঁকে কোনও ইঞ্জেকশন দেন, তার কিছুক্ষণ পর লোকটির মৃত্যু হয়। তখন লোকটির পরিজনরা ডাক্তারদের গাফিলতির অভিযোগ আনেন। এবার সম্পাদক মহাশয়, আপনি বলুন এই অভিযোগ যদিও তদন্তসাপেক্ষ তবুও অভিযোগ উত্থাপন করা কি অন্যায়? রোগীর পরিজন বলেন, কী ইঞ্জেকশন দিলেন বলতে হবে। এটা কি কোনও অনৈতিক অনুরোধ? উত্তেজনা বাড়ে। ডাক্তাররা রোগীর মৃতদেহ আটকে রাখেন। অর্থাৎ বেআইনি কাজ রোগীর পরিজনরা নয়, ডাক্তাররাই প্রথম করেছিলেন এবং বেআইনি কাজের বিরুদ্ধে যা হয়েছিল সেটাও আইনসিদ্ধ নয়।

তারপর শুরু হয় আপনাদের সেই তথাকথিত আন্দোলন যাকে আপনারা দু'হাত তুলে সমর্থন করেছেন। কেন? গণদাবীতে যাঁরা লেখেন আর গণদাবী যাঁরা পড়েন তাঁরা আর ডাক্তাররা একই শ্রেণির লোক বলে? ডাক্তারদের মারধর করাটাকে আমি কোনও রকমেই সমর্থন করি না। কিন্তু রোগীদের প্রতি ডাক্তারদের এই অবহেলাকে আরও বেশি অসমর্থন করি। এমন হতে পারে (আমি মোটামুটি নিশ্চিত তাই হয়েছিল) হাসপাতালে ডাক্তারের সংখ্যার অপ্রতুলতার জন্য অথবা/এবং কতর্ব্যরত ডাক্তারদের উপর অসম্ভব চাপ থাকার জন্য ডাক্তাররা আসতে পারেননি, তার সঙ্গে ক্লান্তিও ছিল। অর্থাৎ এই হৃদয়হীনতা শুধু এক বা কয়েকজন ডাক্তারের নয় সমগ্র সিস্টেমের। আমার প্রস্তাব, আন্দোলনটা তো এর ভিত্তিতে হতে পারত? হাসপাতালে কেন যথেষ্ট সংখ্যায় ডাক্তার-নার্স থাকবে না? কেন কোনও রোগীর পরিজনকে নিজের গাঁটের কড়ি খরচা করে আলাদা করে আয়া রাখতে হবে? কেন ওয়ার্ডে বেড়াল, কুকুর ঘুড়ে বেড়ায়? কেন হাসপাতালে ওষুধ থাকবে না? কেন হাসপাতালে চাকরিরত ডাক্তাররা বাইরে দোকান খুলে বসবেন? কেন এক্স-রে, ই সি জি মেশিন থাকবে না, বা থাকলে খারাপ থাকবে? অর্থাৎ আন্দোলনটা পুরো স্বাস্থ্যব্যবস্থা সংস্কার করার জন্য হতে পারত। ডাক্তারদের নিরাপত্তার মতো গুরুত্বহীন সমস্যাটা আপনাআপনি সমাধান হয়ে যেত। কিন্তু এই আন্দোলনটা হত অত্যন্ত কঠিন, একেবারে বিসমিল্লায় নাড়া দিতে হত। তাই সবাইকার মতো আপনারাও সে পথে না গিয়ে সহজ আর সস্তা পথটা ধরলেন। সেক্ষেত্রে বাজারি খবরের কাগজের সঙ্গে আপনাদের আর কী তফাৎ রইল? আপনারা পছন্দ করবেন না জেনেও বলছি প্রকৃত গণতান্ত্রিক আন্দোলনের একটা সম্ভাবনাকে অঙ্কুরেই বিনাশ করে দিলেন। নমস্কারান্তে —

সৌম্যেন্দ্র গোস্বামী
শিবতলা, হুগলি

গণদাবীর বক্তব্য

প্রিয় সৌম্যেন্দ্রবাবু,

আপনার চিঠির জন্য ধন্যবাদ। তবে অধ্যাপক প্রদীপ দত্তের চিঠিকেই আমাদের সামগ্রিক অভিমত ধরে নেওয়াটা আপনার ঠিক হয়নি। পাঠকের মতামত বিভাগে অনেক চিঠি আসে, আমরা বিরুদ্ধ মত হলেও প্রকাশ করার চেষ্টা করি যদি তাতে নির্দিষ্ট বক্তব্য থাকে। যেমন আপনার চিঠি। পাঠকের মতামতের ওই চিঠি আমাদের বক্তব্য হলে সেটি ওরকম একদেশদর্শী হত না। গণদাবীর ঠিক আগের সংখ্যায় জুনিয়র ডাক্তার আন্দোলন সম্পর্কে ছাত্র সংগঠন ডি এস ও-র বক্তব্য ও বিভিন্ন পর্যায়ে এস ইউ সি আই (সি)-র বিবৃতিগুলি প্রকাশ করা হয়েছিল, যা দেখা বোধহয় আপনার পক্ষে সম্ভব হয়নি।

আপনি সরকারি হাসপাতালে দুঃস্থ ও গরিব রোগীদের দুরবস্থার কথা বলেছেন যার সাথে আমরা সম্পূর্ণ একমত। কিন্তু তার সমাধান তো জুনিয়র ডাক্তারদের ধরে পেটানো নয়! কী ভয়ানক পরিবেশে, কী অসহায়তা ও চাপের মধ্যে এই ডাক্তারদের কাজ করতে হয়, তা আপনিও জানেন বলে মনে হয়েছে চিঠি থেকে। ফলে হাসপাতালের পরিকাঠামো উন্নয়নের দাবি অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গত এবং এবারও তা ছিল। এই আন্দোলনে ছাত্র সংগঠন এ আই ডি এস ও-র সদস্যরা থাকলেও মূল নেতৃত্বে ছিল টি এম সি পি। কর্মবিরতি শুরু হওয়ার পর বিজেপি, সিপিএমও ঢুকে পড়ে জল ঘুলিয়ে মাছ ধরার চেষ্টা করেছে, নিজ নিজ সংকীর্ণ দলীয় স্বার্থ অনুযায়ী আন্দোলনকে চালাবার চেষ্টা করেছে, রাজ্য সরকারের সাথে বৈঠকের বিরোধিতা করে তারা চেয়েছে হাসপাতালগুলির অচলাবস্থা যাতে চলতেই থাকে। ওই অবস্থায় ডি এস ও কর্মীদের মাথা ঠাণ্ডা রেখে আন্দোলনকে সঠিক খাতে নেওয়ার জন্য দিনরাত পরিশ্রম করতে হয়েছে, বোঝাতে হয়েছে। বারবার আক্রান্ত হতে থাকা জুনিয়র ডাক্তাররা নিরাপত্তার দাবিতে আন্দোলন শুরু করলেও ডি এস ও-র প্রচেষ্টাতেই স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর উন্নয়ন সংক্রান্ত দাবিগুলি গৃহীত হয়েছিল। এ ছাড়া কর্মবিরতির সময় যাতে এমারজেন্সি খোলা রাখা হয় তার জন্য বারবার চেষ্টা করা হয়। উত্তরবঙ্গ সহ বেশকিছু কলেজে এবারও এটা সম্ভব হয়েছিল যেহেতু সেখানে ডি এস ও-র প্রভাব বেশি। ফলে সাধারণ মানুষের সংকটের কথা আমরা ভাবিনি, এই অভিযোগ ঠিক নয়।

আপনি জানেন ও লিখেছেন যে, রোগটা সমগ্র সিস্টেমের। জুনিয়র ডাক্তারদের আন্দোলন কিন্তু সেটাই বলতে চেয়েছিল। কতটা পেরেছে সেটা ভিন্ন কথা। অন্য কোনও মতলব তাদের ছিল বলে মনে হয়নি। আপনি গণদাবীর লেখক -পাঠক-জুনিয়র ডাক্তারদের একই শ্রেণিভুক্ত করে কী বলতে চেয়েছেন, তা স্পষ্ট হল না। হয়তো বলতে চেয়েছেন, এরা সকলেই উচ্চ শ্রেণির মানুষ, গরিবের দুঃখ বোঝে না। আপনাকে অনুরোধ, এক দিন গণদাবী অফিসে এসে দেখে যান কারা এই কাগজে লেখে। আপনিও তো একজন পাঠক, আপনি কি ওই শ্রেণির?

আবার ধন্যবাদ চিঠি পাঠানোর জন্য।

বিদ্যুৎ ও কৃষির নানা দাবিতে
জৌনপুরে আন্দোলনে এসইউসিআই(সি)

বিদ্যুৎ শুল্ক ২৫ থেকে ৩০ শতাংশ বৃদ্ধির সুপারিশ, চাষের জন্য নালায় পর্যাপ্ত জল না দেওয়া, সার বীজ কীটনাশকের দাম বৃদ্ধি সহ অন্যান্য সমস্যার বিরুদ্ধে উত্তরপ্রদেশে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর জৌনপুর জেলা কমিটির পক্ষ থেকে ৬ জুলাই মিছিল করে গিয়ে বদলাপুরে মহকুমা শাসকের দপ্তরে বিক্ষোভ দেখানো হয়। মিছিলে সামিল শতাধিক শ্রমিক-চাষি এবং ছাত্র-যুবক কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে স্লোগান দেন। কেন্দ্রীয় বাজেটের নিন্দা করে বলা হয়

এটি সম্পূর্ণরূপে জনবিরোধী এবং পুঁজিপতিদের স্বার্থে তৈরি। শেষে মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশে ছয় দফা দাবিপত্র বদলাপুর এসডিএম-এর কাছে জমা দেওয়া হয়।

মন্ত্রী-বিধায়কদের ভাতাবৃদ্ধি

একের পাতার পর

নিচ্ছে, তাদের দুরবস্থা দূর হবে কী করে?

দেশের মানুষকে আজ তাদের জবাব দিতে হবে, রাজনীতিকে তাঁরা কী হিসাবে দেখেন— দেশসেবা না আখের গোছানোর উপায়। যদি রাজনীতি মানে দেশসেবা হয়, তবে কোনও মানুষকে ক্ষুধার্ত অবস্থায় ফেলে রেখে নিজেদের স্বার্থ গুছিয়ে নেওয়ার মধ্যে কোথায় দেশ? কোথায় দেশের মানুষ? সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বলেছিলেন, "দেশসেবা কথার কথা নয়, দেশ আর দেশসেবক এর মাঝে আর কিছু থাকবে না। ...." এই সব মন্ত্রী-বিধায়করা বলবেন, এ ধারণা পরাধীন ভারতের, এখন দেশ স্বাধীন। কিন্তু স্বাধীন দেশে কি মানুষের দারিদ্র ঘুচে গেছে, শিক্ষা-স্বাস্থ্যের দাবি মিটেছে? মহিলারা মর্যাদার সাথে বাঁচতে পারছে? মানুষের বেঁচে থাকার মতো কাজ জুটছে?

সকলেই জানেন, এগুলির কোনওটিই মেটেনি। তাহলে স্বাধীন ভারতেও রাজনীতির উদ্দেশ্য হওয়া উচিত তো মানুষের উপরোক্ত দাবিগুলি মেটানোর দাবিতে লড়াই করা। যে রাজনীতিকরা ক্ষমতায় গিয়ে আগে নিজেদের মাইনে বাড়ানোর জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েন, তাঁরা কী করে মানুষের দাবিতে লড়াই করবেন? এই জন্যই, দশকের পর দশক চলে গেলেও দেশের মানুষের ন্যূনতম দাবিগুলি আজও মিটল না। এইজন্যই প্রতি পাঁচ বছরে এমএলএ-এমপি-মন্ত্রীদের সম্পদের পরিমাণ লাফিয়ে বেড়ে যায়। আর সাধারণ মানুষের অবস্থা খারাপ থেকে আরও খারাপ হয়। রাজনীতির প্রকৃত উদ্দেশ্যটাকেই এঁরা আজ গুলিয়ে দিচ্ছেন।

শাসক দলের বিধায়ক-মন্ত্রীরা শুধু নয়, বিরোধী দল কংগ্রেস-সিপিএম-বিজেপির বিধায়করাও নানা বাক্যছটার আড়ালে বিধায়কদের এই ভাতাবৃদ্ধিকে দু'হাত তুলে স্বাগত জানিয়েছেন। এ ক্ষেত্রে কোনও মতপার্থক্য নেই! এই সমস্ত দলগুলির বিধায়ক-মন্ত্রীরা নির্বাচনে জেতার জন্য জনগণের প্রতিনিধি বলে নিজেদের দাবি করলেও জিতে যাওয়ার পর আর জনগণের দিকে ফিরেও তাকান না। তারা ঠাণ্ডাঘরে ঠাণ্ডা মাথায় দেশের আসল শাসক পুঁজিপতি শ্রেণির স্বার্থে কাজ করতে গিয়ে জনগণের সর্বনাশের নানা কৌশল নিতে থাকেন এবং নানা জনবিরোধী সিদ্ধান্তে সিলমোহর দেন। কারণ, এই ক্ষমতালোভী দলগুলি সবই শোষকের পক্ষে। ক্ষমতায় থাকুক বা গদিচ্যুত হোক, এরা শোষক শ্রেণির তথা পুঁজিপতি শ্রেণিরই দল। নিজেদের আখের গোছাতে, স্বজনপোষণ করতে তারা ক্ষমতার গদিতে বসেন। স্বাভাবিকভাবেই শোষিত গরিব মানুষের জন্য তাদের ছিটেফোঁটা দরদও নেই।

শোষিত শ্রেণি তথা শ্রমিক শ্রেণির দলের বিধায়করাই একমাত্র জনগণের প্রতিনিধিত্ব করতে পারেন। তাই তারা ভাতা বৃদ্ধির প্রতিবাদ করেন। দাবি করেন, স্বাস্থ্য-শিক্ষায় বরাদ্দ বাড়াক সরকার, বেকারদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করুক। এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) দলের প্রাক্তন বিধায়ক কমরেড দেবপ্রসাদ সরকার বিধানসভার অভ্যন্তরে বারবার ভাতাবৃদ্ধির বিরোধিতা করেছেন। পরবর্তী সময়ে বিধায়ক তরুণ নস্কর ও জয়কৃষ্ণ হালদারও ভাতা বৃদ্ধির বিরোধিতা করেছেন। পার্লামেন্টে ৫৪৩ জন সাংসদ যাদের সিংহভাগই কোটি কোটি টাকার মালিক, তাদের কেউ এর বিন্দুমাত্র বিরোধিতা করলেন না। একমাত্র এস ইউ সি আই (সি)-র সাংসদ তরুণ মণ্ডল সাংসদদের বেতন ও ভাতা বৃদ্ধির তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন। তার জন্য এঁদেরকে অন্য সাংসদ-বিধায়কদের অনেক বিদ্রূপ শুনতে হয়েছে। সাংসদের অ্যাকাউন্টে বর্ধিত বেতন-ভাতা এসে গেলে সেই বর্ধিত অর্থ সাংসদ তরুণ মণ্ডল নিজ সংসদীয় ক্ষেত্র জয়নগরে জনসাধারণের শিক্ষা-চিকিৎসা খাতেই খরচ করেছেন। আজকের যুগে জনপ্রতিনিধির সংজ্ঞা বদলে গেলেও দলের শিক্ষায় শিক্ষিত, শোষিত শ্রেণির চেতনায় উদ্বুদ্ধ এই বিধায়ক-সাংসদরা অর্থলোভ, ক্ষমতার লোভের পরোয়া না করে জনহিতেই নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন। আজ সেই প্রতিবাদের কণ্ঠ কোথায়?

নিজেদের আখের গোছানো ওই বিধায়করা জনগণের প্রতিনিধিত্ব করতে পারেন কি? তাদের নির্বাচিত করার আগে মেহনতি মানুষকে তা ভাবতে হবে বৈকি।

নবজাগরণের পথিকৃৎ বিদ্যাসাগর

(ভারতীয় নবজাগরণ আন্দোলনের পথিকৃৎ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের দ্বিশত জন্মবার্ষিকী আগতপ্রায়। সেই উপলক্ষে এই মহান মানবতাবাদীর জীবন ও সংগ্রাম পাঠকদের কাছে ধারাবাহিকভাবে তুলে ধরা হচ্ছে শিক্ষাগ্রহণের জন্য।)

(২)

কর্মজীবনে বিদ্যাসাগর

সংস্কৃত কলেজের পাঠ শেষ করার পর বিদ্যাসাগর বীরসিংহে গেলেন। ওই সময় মধুসূদন তর্কালঙ্কারের মৃত্যু হওয়ায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রধান পণ্ডিতের পদ খালি হয়। অনেকেই এ পদ পাওয়ার জন্য দরখাস্ত করেন। মার্শাল সাহেব ছিলেন ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের সেক্রেটারি। তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য সম্পর্কে অত্যন্ত শ্রদ্ধাবান ছিলেন। মার্শাল সাহেবের একান্ত ইচ্ছা ওই পদে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে নিয়োগ করা। তিনি তাঁকে ওই পদে যোগ দেওয়ার জন্য আহ্বান করলেন। পিতা ঠাকুরদাস এ খবর পেয়ে গ্রাম থেকে পুত্রকে কলকাতায় নিয়ে এলেন। ১৮৪১ সালের ২৯ ডিসেম্বর থেকে বিদ্যাসাগর হলেন ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রধান পণ্ডিত, যখন তাঁর বয়স মাত্র ২১ বছর। পঞ্চাশ টাকা বেতন।

বিলেত থেকে যে সব সাহেবরা এ দেশে চাকরি করতে আসত তাদের ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে বাংলা, হিন্দি, উর্দু ও ফারসি পড়তে হত। পরীক্ষায় পাশ করতে পারলে তারা কাজে যোগ দিতে পারত। পাশ করতে না পারলে তাদের বিলেতে ফিরে যেতে হত। এদের মাসে মাসে যে পরীক্ষা দিতে হত তার খাতা দেখতে হত বিদ্যাসাগর মহাশয়কে। হিন্দি পরীক্ষার খাতাও তাঁকে দেখতে হত, আবার অধ্যাপনার প্রয়োজনে ইংরেজদের সঙ্গে তাঁকে যোগাযোগ করতে হত। বিদ্যাসাগর হিন্দি ও ইংরেজি ভাল জানতেন না। তাই ছাত্রদের ভাল করে পড়ানোর জন্য তিনি হিন্দি, ইংরেজি ও অঙ্ক শিখতে শুরু করলেন। একজন হিন্দুস্তানী পণ্ডিতের কাছে ২-৩ মাসে হিন্দি তিনি সহজেই শিখে নিলেন। ইংরেজি শেখা তুলনায় কষ্টকর। কিন্তু তাঁর ছিল অসাধারণ অধ্যবসায় ও মনোবল। ডাক্তার দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাক্তার নীলমাধব মুখোপাধ্যায়, হিন্দু কলেজের ছাত্র রাজনারায়ণ গুপ্ত প্রমুখের কাছে তিনি ইংরেজি শিখতে যেতেন। শেকসপিয়র পড়বার জন্য শোভাবাজার রাজবাড়িতে আনন্দকৃষ্ণ বসুর কাছে যেতেন। এখানে তাঁর অক্ষয়কুমার দত্তের সাথে পরিচয় হয়। অক্ষয়কুমার 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার' সম্পাদক ছিলেন। সম্পাদনার কাজ করতে গিয়ে তিনি কিছু প্রবন্ধের অনুবাদ করতেন, রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের অনুরোধে সেগুলি পড়ে বিদ্যাসাগর মহাশয় সংশোধন করে দিতেন। অক্ষয়বাবু সেই সুন্দর সংশোধন দেখে অত্যন্ত আনন্দিত হতেন। যদিও দু'জনের কেউ কাউকে চিনতেন না। পরে তাঁদের পরিচয় হয়। অক্ষয়কুমারের অনুরোধে এবং পাঠ্যপুস্তকের অভাব পূরণ করার জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয় নিজেই অনুবাদের কাজে হাত দেন। তিনি 'মহাভারত' অনুবাদ শুরু করেন, এটি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু তিনি এই অনুবাদ সম্পূর্ণ করেননি। পরে 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা'র লেখক কালীপ্রসন্ন সিংহ তাঁর সম্মতি নিয়ে সম্পূর্ণ মহাভারত অনুবাদ করেন।

নিজে অন্যের কাছে ইংরেজি শিখতেন, আবার হাইকোর্টের অন্যতম অনুবাদক শ্যামাচরণ সরকার, রামরতন মুখোপাধ্যায়, নীলমণি মুখোপাধ্যায়, রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মার্শাল সাহেব প্রমুখ অনেকেই তাঁর কাছে সংস্কৃত ও বাংলা শিখতে আসতেন। তাঁর শেখানোর পদ্ধতি ছিল অত্যন্ত সহজ। সহজ উপায়ে সংস্কৃত শিক্ষার জন্য তিনি উপক্রমণিকা লেখেন। কলেজে পড়ানোর সাথে সাথে নিজে হিন্দি, ইংরেজি শেখা, সংস্কৃত শেখানো, এর জন্য সহজ উপায়ের বই লেখা— এরকম বহুমুখী কাজ একসঙ্গে তিনি করেছেন। এ সময় পিতা ঠাকুরদাস কাজে যাওয়ার পথে দুর্ঘটনায় আহত হন। বিদ্যাসাগর পিতাকে বলেন—'বাবা আপনার তো অনেক বয়স হয়েছে। অনেক পরিশ্রম করেছেন আপনি। আমি তো এখন মাসে ৫০ টাকা মাইনে পাচ্ছি, স্বচ্ছন্দে সংসার চলবে, আপনি আর কেন পরিশ্রম করবেন? আপনি দেশে গিয়ে থাকুন।'

প্রথমে চাকরি ছাড়তে রাজি হননি ঠাকুরদাস। চাকরি ছাড়ার কথা মনিবকে জানালে তিনি তাঁকে বললেন, 'ছেলেমানুষের কথায় চাকরি ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়। ওই ছেলে যদি উচ্ছৃঙ্খল হয়ে তোমাকে সাহায্য না করে তখন কি আবার চাকরি করতে আসবে?'

ঠাকুরদাস মনিবকে বললেন—'আমার পুত্র সাক্ষাৎ যুধিষ্ঠিরের মতো ধর্মশীল, আমাকে দেবতার মতো ভক্তিশ্রদ্ধা করে, তার কথা অবহেলা করতে পারব না। যদি তাকে অধার্মিক ও দুশ্চরিত্র জানতাম, তা হলে কখনওই চাকরি ছাড়তাম না।' চাকরি ছেড়ে বাড়ি ফিরে গেলেন ঠাকুরদাস।

পিতাকে বিদ্যাসাগর মাসে মাসে ২০ টাকা পাঠিয়ে দিতেন, নিজের বাসায় ৩০ টাকা খরচের জন্য রাখতেন। বাসায় তখন তাঁর দুই ভাই, দু'জন খুড়তুতো ভাই, পিসতুতো-মাসতুতো তিন ভাই। এ ছাড়াও দু'চার জন অতিথি প্রায়ই থাকতেন। সকলের খরচ তাঁকেই চালাতে হত। খুবই কষ্টে চলত তাঁদের। নিজেরা ভাগাভাগি করে রান্না করতেন। খরচ বাঁচিয়ে দুঃস্থদের সাহায্যও করতেন।

তিনি সব সময় অন্যের দুঃখমোচনের জন্য নিজে কষ্ট স্বীকার করতে প্রস্তুত ছিলেন। এই সময় সংস্কৃত কলেজের ব্যাকরণের প্রথম শ্রেণির অধ্যাপকের পদ শূন্য হয়। মার্শাল সাহেব বিদ্যাসাগরকে ওই পদ গ্রহণ করতে অনুরোধ করেন। ওই পদের বেতন ৮০ টাকা। যে কোনও মানুষের পক্ষে বেশি টাকার চাকরি লোভনীয় সুযোগ, কিন্তু বিদ্যাসাগর ছিলেন অন্য ধরনের মানুষ। তাই বেতন বেশি হলেও তিনি ওই পদ গ্রহণে সম্মত হলেন না। কারণ তিনি তারানাথ তর্কবাচস্পতিকে কথা দিয়েছিলেন যেভাবেই হোক তাঁকে একটি চাকরি জোগাড় করে দেবেন। তাঁর একটি চাকরি ভীষণ দরকার ছিল। তাই সংস্কৃত কলেজের ওই পদে তিনি তারানাথ তর্কবাচস্পতিকে নিয়োগের অনুরোধ করেন। তাঁর অনুরোধে মার্শাল সাহেব অবাক হলেন। তিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন বিদ্যাসাগরকে, তাই রাজি হলেন বিদ্যাসাগরের অনুরোধ রাখতে। ওই সময় তারানাথ তর্কবাচস্পতি কালনায় ছিলেন। চিঠি পাঠালে তিনি ঠিক সময়ে নাও পেতে পারেন এজন্য বিদ্যাসাগর মহাশয় ২৪/২৫ ক্রোশ (প্রায় ৫০ মাইল) রাস্তা সারা রাত পায়ে হেঁটে তার বাড়িতে গিয়ে পরদিনই তাঁকে সঙ্গে করে এনে সংস্কৃত কলেজের চাকরিতে যুক্ত করিয়ে দেন।

১৮৪৬ সালের মার্চ মাসে সংস্কৃত কলেজের অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি রামমাণিক্য বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের মৃত্যু হয়। বাবু রসময় দত্ত তখন সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটারি ছিলেন। তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়কে ওই পদে নিয়োগ করতে চাইলেন। রসময়বাবু সহ অনেকের অনুরোধে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের কাজ ছেড়ে এপ্রিল মাসে সংস্কৃত কলেজের চাকরিতে যোগ দিলেন বিদ্যাসাগর।

সংস্কৃত কলেজে যোগ দিয়ে তিনি বেশ কিছু সংস্কার শুরু করেন। তাঁর চেষ্টায় কলেজে শৃঙ্খলা এল। বিদ্যাসাগর সহকারী সম্পাদক, রসময় দত্ত ছিলেন সম্পাদক। শুধু চাকরি করা বিদ্যাসাগরের উদ্দেশ্য ছিল না, উদ্দেশ্য ছিল এ দেশের মানুষের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার করা। তাই কলেজের উন্নয়ন সম্পর্কে একটি পরিকল্পনা তৈরি করে সেক্রেটারি রসময় দত্তের কাছে পাঠিয়ে দিলেন বিদ্যাসাগর। রসময় দত্ত এই পরিকল্পনার সঙ্গে পুরোপুরি একমত হতে পারলেন না। বিদ্যাসাগরের অনুরোধ সত্ত্বেও তিনি সম্পূর্ণ পরিকল্পনাটি কাউন্সিলে পাঠালেন না, সামান্য একটু অংশ পাঠালেন। খুবই আঘাত পেলেন বিদ্যাসাগর। মতপার্থক্য শুরু হল দু'জনের। বিদ্যাসাগর বুঝতে পারলেন নিজের পরিকল্পনা মতো কলেজের উন্নতি তিনি করতে পারবেন না। তাই ঠিক করলেন যেখানে স্বাধীনভাবে কাজ করা যাবে না সেখানে চাকরি করবেন না। ১৮৪৭ সালের এপ্রিল মাসে ইস্তফাপত্র পাঠিয়ে দিলেন। তাঁর আয়ের উপরে নির্ভরশীল সকলেই অবাক। সংসারে অনেকজন সদস্য, এমন অবস্থায় চাকরি ছেড়ে দিলে কীভাবে চলবে! এইরকম অবস্থায় চাকরি ছেড়ে দেওয়ার তেজ যে কারও থাকতে পারে ভাবতেও পারেননি রসময় দত্ত। অনুরোধ সত্ত্বেও বিদ্যাসাগর ইস্তফাপত্র প্রত্যাহার না করায় ১৬ জুলাই তা গৃহীত হয়।

রসময় দত্ত কিছুজনের কাছে বলেছিলেন—চাকরি ছেড়ে দিয়ে বিদ্যাসাগর খাবে কী? কথাটি কানে এলে বিদ্যাসাগর বলেছিলেন,—'দত্তমশাইকে বোলো, বিদ্যাসাগর আলু পটল বেচে খাবে, মুদির দোকান করে খাবে, কিন্তু যে চাকরিতে সম্মান নেই, সে-চাকরি করবে না।' *(চলবে)*

প্রশ্ন ইতিমধ্যেই

দুয়ের পাতার পর

মানুষের অবস্থার পরিবর্তনটাই বা ঘটবে কোথা থেকে! লোকসভা নির্বাচনের আগে থেকেই মানুষ দেখছে বিজেপি কীভাবে দল ভাঙানো শুরু করেছে। পদের লোভ, অর্থের লোভ দেখিয়ে, চুরি-দুর্নীতিতে অভিযুক্তদের পুলিশ-প্রশাসন এবং বিচার প্রক্রিয়া সামলে দেওয়ার স্তোক দিয়ে দলভারি করছে। এইভাবে তৃণমূলের কায়দাতেই একের পর এক তৃণমূলের পুরসভাগুলির কাউন্সিলারদের ভাঙিয়ে এনে সেগুলির দখল নিয়েছিল তারা। গোটা প্রক্রিয়াটার মধ্যে নীতি-নৈতিকতার কোনও বালাই না থাকায় ক'দিন না যেতেই আবার তাদের একটা অংশ তৃণমূলে ফিরে আসছে। পুরো ব্যাপারটাই আসলে দরকষাকষির। এতে জনস্বার্থের চিহ্নমাত্র নেই।

জনজীবনের জ্বলন্ত সমস্যাগুলি, যা নিয়ে মানুষ জেরবার হয়ে যাচ্ছে, সেগুলি নিয়ে এই দলগুলির কারও কোনও মাথাব্যথা মানুষ দেখতে পাচ্ছে না। মূল্যবৃদ্ধি লাগামছাড়া হলেও এই দলগুলির নেতা-মন্ত্রীরা মানুষকে শুধু মিথ্যা স্তোক দিয়ে যাচ্ছেন— সব কিছুই সরকারের নিয়ন্ত্রণে। কর্মসংস্থান নিয়ে মন্ত্রীরা টুঁ শব্দ করছেন না। কৃষকের ফসলের ন্যায্য দাম পাওয়ার কোনও ব্যবস্থা নেই। মালিক শ্রেণির স্বার্থে শ্রম আইন বদলে দিয়ে শ্রমিকদের উপর আরও বোঝা চাপানোর ব্যবস্থা করছে সরকার। মহিলাদের উপর নির্যাতন অতীতের সব রেকর্ড ছাড়িয়ে যাচ্ছে। এ সবের হাত থেকে রেহাইয়ের কোনও কর্মসূচিই এই দলগুলির কারও নেই। বাস্তবে যে রাজনীতির চর্চা এই দলগুলি করে তা শুধুমাত্র মালিক শ্রেণির স্বার্থই রক্ষা করে, সাধারণ মানুষের স্বার্থ নয়। তাই এদের জয়ে মালিকরা, পুঁজিপতি শ্রেণি উচ্ছ্বসিত। নির্বাচনে এদের পিছনে তারা টাকা ঢালে। কিন্তু এই ভ্রষ্ট রাজনীতি, যা মানুষকে ক্রমাগত প্রতারিত করে চলেছে, এর হাত থেকে রেহাইয়ের উপায় তা হলে কী? উপায় একটাই— পুঁজিপতি শ্রেণি তাদের তাঁবেদার এই রাজনৈতিক দলগুলির নেতা-মন্ত্রীদের সাথে যোগসাজশে একতরফা যে শোষণ-অত্যাচার সাধারণ মানুষের উপর চালিয়ে যাচ্ছে তার বিরুদ্ধে যথার্থ বামপন্থীদের নেতৃত্বে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে শোষিত মানুষের ঐক্যবদ্ধ ভাবে দাঁড়ানো, জীবনের দাবিগুলি নিয়ে প্রবল গণআন্দোলন গড়ে তোলা। আন্দোলন গড়ে তুলতে গিয়ে শোষিত মানুষের সংহতি গড়ে তোলা। সর্বত্র আন্দোলনের কমিটি গড়ে তোলা। শক্তি সঞ্চয়ের মধ্যে দিয়ে সেগুলিই এক দিন শোষণমূলক এই সমাজটিকে বদলে দেবে।

পশ্চিমবঙ্গ আশা কর্মী ইউনিয়নের ডাকে কলকাতায় স্বাস্থ্যভবন অভিযান সফল করতে ৬ জুলাই ১নং ব্লকে আশাকর্মীদের হাওড়ার উলুবেড়িয়ায় সভা

বেলদায় ওভারব্রিজের দাবি

৮ জুলাই বেলদায় জনঅভিযোগ প্রতিবিধান শিবিরে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম মেদিনীপুর জেলাশাসক। বেলদা হাওড়া লোকাল বাঁচাও ও যাত্রী সুরক্ষা কমিটির তরফে তাঁর কাছে দাবি জানানো হয় বেলদা হাসপাতালগামী লেভেল ক্রসিংয়ে ওভারব্রিজ নির্মাণের। ২৭ জুন খড়্গপুর এ ডি আর এমকে স্মারকলিপি দিয়ে বেলদা-কেশিয়াড়ি মোড়ে রেল গেট ও ওভারব্রিজের দাবি তোলা হয়। ইতিমধ্যে বেলদা স্টেশনে কমিটির দাবিতে চালু হয়েছে মোটরসাইকেল ও সাইকেল স্ট্যান্ড।

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2019-21

‘জয় শ্রীরাম’ বললেই চাকরি মিলবে তো? যুব সমাবেশে প্রশ্ন

যুব সংগঠন এ আই ডি ওয়াই ও-র ৫৪তম প্রতিষ্ঠা দিবস ২৬ জুন উপলক্ষে ৭ জুলাই সংগঠনের কলকাতা জেলা কমিটির উদ্যোগে

কলকাতা

ভারত সভা হলে যুব সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। বক্তব্য রাখেন সর্বভারতীয় কমিটির সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড উমা দেবী, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক কমরেড নিরঞ্জন নস্কর। তিন শতাধিক যুবক-যুবতী উপস্থিত ছিলেন। বক্তারা বলেন, দেশে বেকারত্ব গত ৪৫ বছরে সর্বোচ্চ। মোদি সরকারের বাজেটে চাকরির কোনও সুনির্দিষ্ট দিশা নেই। জয় শ্রীরাম ধ্বনি তুলে বিজেপি রাজ্যে রাজ্যে সংখ্যালঘু নিগ্রহের যে সংস্কৃতি আমদানি করেছে তার তীব্র সমালোচনা করে বক্তারা বলেন, জয় শ্রীরাম ধ্বনি তুললে বেকারদের চাকরি হবে? অনাহারে মৃত্যু, বিনা চিকিৎসায় মৃত্যু বন্ধ হবে? প্রতি চার মিনিটে একজন নারী নির্যাতিতা হচ্ছেন, তা বন্ধ হবে? সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন জেলা সভানেত্রী কমরেড সঙ্গীতা ভক্ত। উপস্থিত ছিলেন জেলা সম্পাদক কমরেড সঞ্জয় বিশ্বাস।

এই উপলক্ষে সংগঠনের দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা কমিটির উদ্যোগে ৭-৮ জুলাই কাকদ্বীপের উকিলের হাটে যুবক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়। সকল বেকারের কর্মসংস্থান, সরকারের মদ্যপ্রসার নীতি প্রতিরোধ ও অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে ২১ আগস্ট বারুইপুরে যুব সমাবেশের কর্মসূচি নেওয়া হয়।

১০ জুলাই পশ্চিম মেদিনীপুর ও ঝাড়গ্রাম জেলা কমিটির উদ্যোগে জেলা শাসক দপ্তর অভিমুখে যুব বিক্ষোভ মিছিল

মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষের গাফিলতিতেই এই মৃত্যু

১৩ জুলাই পার্ক স্ট্রিট মেট্রো স্টেশনে মেট্রো রেকের দরজায় হাত আটকে এক যাত্রীর মর্মান্তিক মৃত্যু প্রসঙ্গে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য ওই দিন এক প্রেস বিবৃতিতে বলেন,

“মেট্রো রেকের দরজায় হাত আটকে থাকা এক যাত্রীকে নিয়ে ট্রেন চলতে শুরু করায় ওই যাত্রীর মর্মান্তিকভাবে মৃত্যু হয়েছে। এই মৃত্যুর ঘটনা কেবল যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে হয়নি, এতে রেল কর্তৃপক্ষের গাফিলতি স্পষ্ট। বারবার কলকাতা মেট্রো রেলে দুর্ঘটনা যাত্রীসাধারণের মনে বিভীষিকা তৈরি করছে। আমরা এই দুর্ঘটনার দ্রুত তদন্ত করে দোষী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার এবং নিহতের পরিবারকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়ার দাবি জানাচ্ছি। একই সাথে দাবি করছি, সকাল এবং রাত্রে মেট্রো পরিষেবার সময় ও ট্রেনের সংখ্যা বাড়াতে হবে।”

স্কুল ও মাদ্রাসার করণিকরা বিক্ষোভে

নানা রকম বঞ্চনার শিকার রাজ্যের সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুল ও মাদ্রাসার করণিকরা। তাঁদের পদমর্যাদা মাধ্যমিক পাশ হওয়ায় বেতন খুবই কম। পদমার্যাদা মাধ্যমিক পাশ হলেও বাস্তবে এ কাজে কর্মরত রয়েছেন উচ্চশিক্ষিত এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অনেকেই। তাদের উপর কাজের চাপ বিপুল। অফিসের নিয়মিত কাজ ছাড়াও কন্যাশ্রী, শিক্ষাশ্রী, সবুজসাথী ইত্যাদি সরকারি নানা প্রকল্পের কাজ তাঁদের করতে হয়। করতে হয় ড্রাফটিং, ডিটিপি, ই-মেল, অনলাইন ডাটা এন্ট্রি, ই-পেনশন, ইপিএফ-এর যাবতীয় কমপিউটার সংক্রান্ত কাজ। কম্পিউটার প্রশিক্ষণ থাকা সত্ত্বেও এদের স্কেলে কোনও স্বীকৃতি নেই। সব চেয়ে বড় কথা, গোটা কর্মজীবনই প্রমোশনহীন।

এই বঞ্চনার প্রতিকারের দাবিতে গড়ে উঠেছে ওয়েস্ট বেঙ্গল স্কুল অ্যান্ড মাদ্রাসা ক্লার্কস অ্যাসোসিয়েশন। ৮ জুলাই কলকাতায় তাঁরা বিক্ষোভ দেখান। প্রায় চার হাজার করণিক উপস্থিতিতে ছিলেন। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক তন্ময় সরকার বলেন, আমাদের দাবি— করণিকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা উচ্চমাধ্যমিক করতে হবে, উচ্চমাধ্যমিক এবং কম্পিউটার প্রশিক্ষণ বিবেচনায় এনে নতুন পে-স্কেল করতে হবে, কর্মজীবনের ৮, ১৩, ২৫ বছরে পরবর্তী উচ্চতর পে-স্কেল দিতে হবে, সরকারি শিক্ষক এবং লাইব্রেরিয়ান পদে নিয়োগে করণিকদের জন্য ১০ শতাংশ সংরক্ষণ করতে হবে। শিক্ষামন্ত্রী দাবিগুলি বিবেচনার আশ্বাস দিয়েছেন।

সরকারি হাসপাতালে ‘পেইড ক্লিনিক’-এর প্রতিবাদ

মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের রাজ্য সম্পাদক ডাঃ অংশুমান মিত্র ৪ জুলাই এক প্রেস বিবৃতিতে বলেন, মুখ্যমন্ত্রী ডক্টরস ডে উপলক্ষে ১ জুলাই এসএসকেএম হাসপাতালে যে পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করেছেন তা এক কথায় স্বাস্থ্যব্যবস্থার বেহাল অবস্থাকে আড়াল করার এক সুচতুর কৌশল ছাড়া কিছু নয়।

তিনি বলেন, সম্প্রতি এনআরএস মেডিকেল কলেজের মর্মান্তিক ডাক্তার নিগ্রহের ঘটনাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা জুনিয়র ডাক্তার আন্দোলন রাজ্য স্বাস্থ্য পরিষেবার কঙ্কালসার চেহারাকে জনমানসে তুলে ধরেছে। তাই ঝুলি থেকে বেড়াল বেরিয়ে যাওয়ার পরেও মূল পরিকাঠামোগত ঘাটতিকে আড়াল করতে মুখ্যমন্ত্রী একদিকে ‘পেইড কেবিন’ ও ‘পেইড ক্লিনিক’ এবং অন্য দিকে ‘পথ বন্ধু’ প্রভৃতি চমক দিয়ে সরকারি সমস্ত দায়ভার ঝেড়ে ফেলতে চেয়েছেন। সরকার যেখানে বিনামূল্যে জনসাধারণের স্বাস্থ্যের সম্পূর্ণ দায়ভার নেওয়ার ও পরিকাঠামোর ঘাটতি পূরণের আশ্বাস দিয়েছিল, সেখানে এই ঘোষণা গত ১৭ জুন আলোচনায় বসা জুনিয়র ডাক্তার প্রতিনিধিদের সাথে শুধু নয় সমস্ত জনগণের সাথে চূড়ান্ত বিশ্বাসঘাতকতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

পূর্বতন সিপিএম সরকার সরকারি হাসপাতালে পিপিপি মডেল চালুর মধ্য দিয়ে এ রাজ্যে স্বাস্থ্যব্যবস্থার বেসরকারিকরণের সূত্রপাত করেছিল। বর্তমান সরকার বেসরকারিকরণের সেই নীতিকেই ব্যাপকভাবে কার্যকরী করার জন্য সরকারি হাসপাতালগুলোকে ‘বাজেট হাসপাতালে’ পরিণত করতে ব্যগ্র হয়ে পড়েছে। তাই মিষ্টি কথার আড়ালে উডবার্ন নার্সিংহোমের উদাহরণ টেনে সরকার সোজা কথায় বুঝিয়ে দিল যে, যার টাকা আছে স্বাস্থ্য পাওয়ার অধিকার একমাত্র তারই আছে। হাসপাতালগুলোতে যথার্থই স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর উন্নতি করতে চাইলে, নানা ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের ও হেলথ ইনসিওরেন্স সহ বহু প্রকল্পের নামে কোটি কোটি টাকা খরচের প্রয়োজন হত না। সরকারের এই জনস্বার্থ বিরোধী পদক্ষেপের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে তিনি আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

অ্যাবেকার বিধানসভা অভিযান

বিদ্যুৎ মাশুল ৫০ শতাংশ কমানো, জঙ্গলমহলে বকেয়া এবং ভুয়ো বিদ্যুৎ বিল মকুব, সি ই এস সি-তে ৩০০ ইউনিট পর্যন্ত সরকারি ভর্তুকির দাবিতে ১০ জুলাই বিক্ষোভ দেখায় সারা বাংলা বিদ্যুৎ গ্রাহক সমিতি (অ্যাবেকা)। বিধানসভার কক্ষের বাইরে এসে অ্যাবেকার নেতাদের কাছ থেকে স্মারকলিপি গ্রহণ করে বিদ্যুৎমন্ত্রী কৃষিতে বিনা পয়সায় বিদ্যুৎ দেওয়ার বিষয়ে বিধানসভায় আলোচনার আশ্বাস দিয়েছেন। কয়েক হাজার বিদ্যুৎ গ্রাহক এদিন রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে জমায়েত হয়ে বিক্ষোভ মিছিলে সামিল হন। সহ সভাপতি অমল মাইতি, সাধারণ সম্পাদক প্রদ্যুৎ চৌধুরীর নেতৃত্বে প্রতিনিধিবৃন্দ বিধানসভাতে বিদ্যুৎমন্ত্রীকে স্মারকলিপি দেন।

প্রদ্যুৎ চৌধুরী বলেন, অ্যাবেকার ধারাবাহিক আন্দোলনের ফলে ৪ বছর বিদ্যুতের দাম রাজ্য সরকার ও বিদ্যুৎ কোম্পানি বাড়াতে পারেনি। আগামী ১ মাসের মধ্যে মাশুল কমানোর সিদ্ধান্ত ঘোষণা না হলে আগামী সেপ্টেম্বরে কলকাতায় হাজার হাজার বিদ্যুৎ গ্রাহক প্রতিরোধ আন্দোলনে সামিল হবেন।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এসইউসিআই(সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৬৫০২৭৬ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৫০২৭৬, e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.ganadabi.com